ফা হিয়েনের দেখা ভারত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়

ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২ :: ১৯৬১

ফা-হিয়েনের দেখা ভারত

ফা-হিয়েনের দেখা ভারত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়

ফার্মা কে. এল্‌. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা-১২ :: ১৯৬১

© প্রথম সংস্করণ ১৯৬১

ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক
৬/১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন,
কলিকাতা-১২

শ্রীপ্রশান্তকুমার মান্না, মুদ্রাকর
মহাকালী প্রেস
৩৪-বি, ব্রজনাথ মিত্র লেন,
কলিকাতা-৯

তিন টাকা

স্বর্গতঃ পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

মুখবন্ধ

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও সর্ব্বশেষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলভাষা যে ভাবে গঠিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, তাহাতে ইহার মাধ্যমে তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদির নিয়মিত প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে। মনীষীত্রয়ের রচনাসমৃদ্ধ বঙ্গভাষা আজ পূর্ণরূপে জাতির চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির বাহনস্বরূপ। ইহার সমৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতা যথার্থরূপে সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি করিতে হইলে বিদেশী ভাষায় লিখিত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থাদি ইহাতে অনূদিত হওয়া আবশ্যক। সুখের বিষয় এ বিষয়ে কুশলী বাঙ্গালী লেখকগণ পশ্চাৎপদ নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যাপক অধ্যয়ন ও সুসংহত চিন্তাশক্তি এদিকে প্রয়োগ করিয়াছেন।

চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভগবান বুদ্ধের জন্মভূমি পরিভ্রমণে আসিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া যান। চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া তিনি তথ্যগুলি 'ফো-কো-কি' (ভগবান বুদ্ধের দেশের বিবরণ) নামক গ্রন্থরূপে প্রকাশ করেন। আধুনিক কালে এই গ্রন্থ কয়েকটি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়া চীনভাষায় অনভিজ্ঞ ভারত-তত্ত্বানুসন্ধানীদিগের বহু উপকারে আসিতেছিল। এই সকল অনুবাদের মধ্যে Legge-কৃত ইংরাজী অনুবাদ তথ্যসমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মীয় ও সামাজিক ইতিহাস প্রণয়ন কল্পে Legge-কৃত অনুবাদটি বিশেষ উপযোগী। বাংলাভাষাতে ইহার একাধিক অনুবাদ আবশ্যক ছিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "ফা-হিয়েনের দেখা ভারত" এই অভাব পূর্ণ করিয়াছে। ইহা ১৩৬৪ সালের ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক এই তিন মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এখন এই বঙ্গানুবাদটি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়া শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার প্রকাশক শ্রী কে. এল. মুখোপাধ্যায় বঙ্গভাষাভাষীদিগের ধন্যবাদ

ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থকারের ভাষা সরল, সাবলীল ও সুখপাঠ্য ; ইঁহার পাদটীকাগুলিও তথ্য-পূর্ণ। গ্রন্থকার ও প্রকাশক এই গ্রন্থপ্রকাশে অগ্রণী হইয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিলেন। বঙ্গীয় বিদ্বজ্জন সমাজে ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ছাত্র-ছাত্রীগণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদক, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা

২৮, মনোহর পুকুর রোড,
কলিকাতা—২৯
তাং ২৮।৫।১৯৬১

সূচীপত্র

ফা-হিয়েনের ভ্রমণ পথ..........
মাইল
০ ২০০ ৪০০
লাওসেন
গোবি মরুভূমি
তুনহোয়াং
চাকুকার
খোটান
চঙ্গংগান
উড্ডীয়ান
বালচা
গান্ধার
নগরহার
পুরুষপুর
তি ব্ব ত
চী ন
হোয়াংহো নদী
সাংকাস্ত
ব্রহ্মপুত্র নদ
শাবস্তী
কপিলাবস্তু
মথুরা
বারানসী
পাটলিপুত্র
গয়া
চম্পা
সাঁচী
রাজগৃহ
তাম্রলিপ্ত
ভা র ত
প্রশান্ত মহাসাগর
অনুরাধাপুর
সিংহল দ্বীপ
স্বর্ণ দ্বীপ
ভা র ত ম হা সা গ র
যব দ্বীপ

অবতরণিকা

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে পুরাণেতিহাস, চরিতনামক রাজন্যেতিহাস ও "রাজতরঙ্গিণী" প্রমুখ প্রাদেশিক ইতিবৃত্তসমূহ ব্যতীত ধারাবাহিক ইতিহাস-রচনার দিকে প্রাচীন ভারতীয়গণের বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল না। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অন্যতম উপাদান যোগিয়েছে বিদেশীয়গণের লিখিত ভারত-বিবরণাদি। বস্তুতঃ অতীতে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে ভারতবর্ষে সমরাভিযান, বাণিজ্য, তীর্থপর্য্যটন বা রাজকার্য্যব্যপদেশে আগমনকারী বৈদেশিকগণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। তাঁহাদের বিবরণাদি থেকে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হয়েছে। তন্মধ্যে পারসিকগণের লিখিত বিবরণাদি প্রাচীনতম বলে পরিগণিত। তাঁদের পরে, নিয়ারকাস, প্রকোপিয়াস, মেগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীকগণ কর্তৃক লিখিত বিবরণাদিতে প্রাচীন ভারতের বহু ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি আমরা অবগত হই। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস-লিখিত বিবরণ মৌর্য্যযুগে ভারতের বিবরণ হিসাবে একটী অতুলনীয় সম্পদ্। চীনের ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজকদিগের লিখিত বিবরণাদি থেকে আমরা কুষাণবংশ, গুপ্তবংশ ও সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সমকালীন ভারত ও তার অধিবাসী সম্বন্ধে জানতে পারি। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর বিখ্যাত আরবদেশীয় পর্য্যটক ও ইতিহাসবেত্তা মাসুদী ও তৎপরে একাদশ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত ইরানী পর্য্যটনকারী ও ইতিহাসবেত্তা অল্‌বিরুণী কর্ত্তৃক লিখিত "তাহ্‌কিক-ই-হিন্দ" বা হিন্দুস্থান তথা ভারতবর্ষের বিবরণপাঠে আমরা তদানীন্তন কালের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার উচ্চশিখরে সমাসীন ভারতবর্ষের বিবিধ তথ্যের সন্ধান পাই।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই চীনদেশের সহিত ভারতের সংযোগ ছিল। কৌটিল্য-লিখিত "অর্থশাস্ত্রে" ও মহাভারতে চীনাদের নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন চীনাসাহিত্যে ভারতের সহিত চীনের আদান-প্রদানের বিষয় ধারাবাহিকভাবে লিখিত রয়েছে।

সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকালে (২৭২-২৪৩ খ্রীষ্টপূর্ব্ব) মধ্য এশিয়ার অভ্যন্তরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৩৬ সালে হান রাজবংশের চীনসম্রাট্ উ, চাং খিয়েন-নামক এক দূতকে মধ্য-এশিয়ার নানা জাতির সহিত সখ্যতাস্থাপনকল্পে উক্ত স্থলে প্রেরণ করলেন। চাং খিয়েন পামিরের অপর পারে বক্ষু বা আমুদরিয়ার নদীতীরে অবস্থিত তুখারদেশের রাজধানীতে অবস্থানকালে চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ইউনান থেকে আনীত পণ্যদ্রব্য দেখতে পান। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে ভারতের সহিত চীনের সম্বন্ধ স্থাপন করবার জন্য চীনসম্রাট্‌কে জানান। এ থেকে আমরা জানতে পারি যে ইউনানের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ প্রাচীন কাল থেকে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই সালে চীনসম্রাট্-সকাশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কুষাণরাজগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের পুঁথিসমেত দূত প্রেরণের পূর্ব্ব থেকে উপরোক্ত ইউনান ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশে ভারত-প্রত্যাগত বৌদ্ধধর্ম্মযাজকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের প্রয়াস পান। অতঃপর আনুমানিক ৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মগধের দুইজন পণ্ডিত কাশ্যপ-মাতঙ্গ ও ধর্ম্মরক্ষ (মতান্তরে ধর্ম্মরত্ন) কুষাণদিগের রাজধানী থেকে চীনদেশের রাজধানীতে গিয়ে চীনাভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ করেছিলেন। এর পর পারশ্যদেশের "আরসকিদীয়" রাজবংশের এক রাজপুত্র বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে ভিক্ষু লোকোত্তম (চীনাভাষায় আন্-মো-কাও) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণান্তর চীনদেশে ১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে উপনীত হন। তিনি সুদীর্ঘ বিশ বৎসর ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের প্রায় ১৭৯ খানি গ্রন্থ চীনাভাষায় অনুবাদ করে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন।

অতঃপর লোকক্ষেমনামক অপর একজন তুখারদেশীয় বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে এসে ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং একজন ভারতীয় ভিক্ষুর সহায়তায় ২৩ খানি বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য চালিয়ে যান।

এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে ভারতীয়, পারসিক, তুখার ও সুগ্দীয় বৌদ্ধপণ্ডিতগণ চীনাভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রাদির অনুবাদ করে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের পথ সুগম করেন এবং উহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

অধ্যাপক লিয়াং-চি-চ্যাও-এর মতে তৃতীয় থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে প্রায় ১৬৯ জন চৈনিক তীর্থযাত্রী ভারতবর্ষে আগমন করেন। তীর্থযাত্রীরা অবশ্য সকলেই মধ্য এশিয়ার 'দুর্গমগিরি-কান্তার-মরু' পথ অতিক্রম করে আসেন নি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আসাম-ব্রহ্মদেশপথে, কেউ কেউ তিব্বত ঘুরে, আবার কেউ কেউ সমুদ্রপথে এসে তদানীন্তন কালের সুসমৃদ্ধ তাম্রলিপ্তি বন্দরে অবতরণ করতেন। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে সকলেই যে অভীষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনে সক্ষম হতেন তা নয়; অনেকে দুর্গম পথের ক্লেশ সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হতেন; অনেকে অভিলষিত কর্ম্মে বিফলমনোরথ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হতেন, অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা করে ভারতবর্ষেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করতেন। বিশেষ ভাগ্যবানেরা বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে স্বদেশে নিজ ভাষায় উহার প্রচার চালিয়ে যেতেন।

ভারতে চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফা-হিয়েন বা ফা-হিয়ান, হিউয়েন-সাং, ইচিং বা আই-ৎ-সিঙ্গ বা ইৎ-সিং। এই প্রথিতযশা বৌদ্ধশ্রমণগণ-লিখিত বিবরণাদির মধ্যে ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রাচীনতম। ফা-হিয়েন ভারতেতিহাসের স্বর্ণযুগে সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে আগমন করেন।

পরিব্রাজকপ্রবর ফা-হিয়েনের আসল নাম ছিল কুঙ্গ। ইনি ৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশের শানসীনামক প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাত্র তিন বৎসর বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষা-গ্রহণের পরে তাঁর ফা-হিয়েন নামকরণ হয়। "ফা-হিয়েন" শব্দের অর্থ "বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি" বা "মূর্ত্ত বিনয়"। উক্ত দীক্ষা-গ্রহণকালে তিনি "সি" নামক উপাধিতেও ভূষিত হন। "সি" শব্দের মর্ম্মার্থ "শাক্যনন্দন"।

ফা-হিয়েন ছিলেন আজন্ম বৌদ্ধভিক্ষু। কথিত আছে যে, চীনে সমাগত সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিত কুমারজীবের শাস্ত্রালোচনায় মুগ্ধ হয়ে ফা-হিয়েন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এর পর থেকেই ভগবান তথাগতের জন্মভূমি পরিদর্শন করে, ভারতের বিবিধ বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রাদির সহিত সম্যক্ পরিচয়লাভ ও বৌদ্ধতীর্থস্থান দর্শন করবার জন্য ফা-হিয়েনের মনে প্রবল স্পৃহা বর্দ্ধিত হতে থাকে। অতঃপর লুই-চিং, তাও-চিং, লুই-হিং ও লুই-ওয়েই এই চারিজন সতীর্থদের সমভিব্যাহারে চী-হাই বর্ষপরিক্রমায় হাংশীয় প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম পাদে এক শুভ প্রভাতে ৬৫ বৎসর বয়সে জ্ঞানভিক্ষু ফা-হিয়েন চ্যাংগান থেকে সুদূর ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করেন। যাত্রাপথে অপর একটি চৈনিক তীর্থযাত্রীদল তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। এই দলে পাঁচজন তীর্থযাত্রী ছিলেন।

সুদীর্ঘ সাতমাস কাল পরে তাঁর সতীর্থদের মধ্যে কেবলমাত্র তিনি ও তাও-চিং মধ্য-এশিয়ার দুর্গম পথ অতিক্রম করে সিন্ধুনদের তীরে ভারতবর্ষের সীমায় প্রবেশ করেন। ফা-হিয়েনের সহযাত্রীদের মধ্যে লুই-ওয়েই ও লুই-হিং পথিমধ্যে পথের ক্লেশ সহ্য করতে অক্ষম হয়ে স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হন। লুই-চিং পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ফা-হিয়েনের অন্যতম সঙ্গী তাও-চিং পাটলীপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে পরিভ্রমণ করেন। তাও-চিং বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে ও দেশবাসীদের দৈনন্দিন জীবনে উহার প্রতিফলন দেখে বিশেষ মুগ্ধ হন ও ভারতবর্ষেই জীবনের অবশিষ্টাংশ

অতিবাহিত করবার সিদ্ধান্ত করেন। ফা-হিয়েন অবশ্য স্বদেশে অর্থাৎ চীনে এই সব মহামূল্যবান্ পুঁথির উল্লিখিত অনুশাসন ও নিয়মাবলী প্রচলন করবার মহান্ উদ্দেশ্যে একাকীই চীনদেশে ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। অতঃপর ফা-হিয়েন একাকী পরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ পরিভ্রমণ করতে থাকেন। এইরূপে ১৪ বৎসর কাল ভারতবর্ষ, সিংহলদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল পরিদর্শনান্তে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থাদির দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও চিত্রাবলী সংগ্রহ করে ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৯ বৎসর বয়সে সমুদ্রপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে অর্থাৎ ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফা-হিয়েন তাঁর "ফো-কিউ-কি" অর্থাৎ বুদ্ধভূমির বিবরণ নামক ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। ফা-হিয়েন স্ব-লিখিত ভ্রমণ-কাহিনী নিজের জবানীতে না লিখে ইতিবৃত্তাকারে লিখে গেছেন, পরে তাঁহার সমসাময়িক সহকর্ম্মী ভিক্ষু আরও একটি পরিচ্ছেদ উক্ত ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

ফা-হিয়েন ছয় বৎসরকাল ভারতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি ভারতের বহু নগর ও বৌদ্ধ তীর্থস্থান যথা মথুরা, কনৌজ, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর, বৈশালী, পাটলীপুত্র, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, কৌশাম্বী, চম্পা ও তাম্রলিপ্তি পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁর বিবরণের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র, বৌদ্ধকাহিনী ও বৌদ্ধকীর্ত্তিকলাপে পরিপূর্ণ। তথাপি তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থে ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের পরিচয়, বৌদ্ধধর্ম্মের তৎকালীন অবস্থা ও ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা একটা আভাস পাই। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তৎকালীন ভারতসম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম তাঁর গ্রন্থে একবারও উল্লিখিত হয় নি। তিনি পাটলিপুত্রে ও নালন্দার মহাবিহারে বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করে বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রাদি সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানসঞ্চয় করেন। কথিত আছে যে, গৌতমবুদ্ধের বংশজাত বুদ্ধভদ্রনামক একজন ভারতীয় শ্রমণ ভারত হতে ফা-হিয়েনের সঙ্গে চীনে গিয়ে শাস্ত্রানুবাদে সহায়তা করেন।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সম্বন্ধে ফা-হিয়েন যা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেনঃ—

"এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের সম্পদে তৃপ্ত ও সুখী। রাজাকে এদের কোনও কর দিতে হয় না বা এদের সম্পত্তির কোন হিসাবও দিতে হয় না। যারা রাজার ভূমি চাষ করে তাদেরই কেবলমাত্র জমি থেকে উদ্ভূত লাভের একটা অংশ রাজ-তহবিলে জমা দিতে হয়। এদেশের অধিবাসীরা যখন খুশী ও যেখানে খুশী চ লে যেতে পারেন বা এসে বাস করতে পারেন। মৃত্যুদণ্ড প্রথা ব্যতিরেকেই এদেশের রাজা তাঁর রাজ্যশাসন করেন। অপরাধের তারতম্য অনুসারে অপরাধীকে লঘু ও গুরুদণ্ড দেওয়া হয়, এমন কি রাজবিদ্রোহীদেরও কেবলমাত্র ডান হাত কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাজার দেহরক্ষী ও পারিষদবর্গকে মাসিক মাহিনার কড়ারে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। একমাত্র চণ্ডাল বাদে কেউই প্রাণীহত্যা করে না, মদ্যপান করে না বা পিঁয়াজ-রশুন খায় না। যারা দুষ্টপ্রকৃতির লোক তাদেরকেই 'চণ্ডাল' নামে অভিহিত করা হয়। এরা অবশ্য সমাজ থেকে আলাদা-ভাবেই বাস করে।·········এদেশের বাজারে কোনও শুঁড়ীর দোকান বা মাংস বিক্রয়ের দোকান নেই। জিনিষপত্র কেনাকাটা হয় কড়ির মাধ্যমেই।"

অন্যত্র দেশের সম্পদ ও অধিবাসীদের অতিথিপরায়ণতা সম্বন্ধে ফা-হিয়েন লিখেছেন—"এই দেশ সত্যই উর্ব্বর এবং ধনধান্যে পূর্ণ। এ রকম সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সম্পদশালিনী ভূমি খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। এমন একটা দেশ দেখা যায় না যার সঙ্গে এর তুলনা চলে। এদেশের লোকেরা অতিথিপরায়ণ এবং বিদেশীয়দের খুবই আদর আপ্যায়ন করেন এবং সর্ব্বদিক দিয়ে তাঁদের সাহায্য করেন যাতে তাঁদের কোনরূপ কষ্ট না হয়।"

সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র সম্বন্ধে ফা-হিয়েন লিখেছেন ঃ—

"মধ্যরাজ্যের মধ্যে পাটলিপুত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর। এখানকার লোকেরা যেমন সুখী ও সম্পদশালী সেইরূপ পরহিতব্রতী। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মঙ্গলচিন্তা করেন। বৈশ্যপ্রধানেরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। সেখান থেকে বিনামূল্যে ঔষধাদি দেওয়া হয়ে থাকে। দরিদ্র অনাথ আতুরদের খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসালয়ে থাকার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে।"

ফা-হিয়েনপ্রমুখ চীনাভিক্ষুদের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করে চীনা বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা ভারতের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন ও ভারত সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞানলাভের আশায় তাঁরা ভারত-অভিমুখে যাত্রা করলেন। এইরূপে চীন ও ভারতের মধ্যে সুদৃঢ় যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বহু শতাব্দী ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল। ফা-হিয়েনের পথে চে-মেং (৪০৪ খ্রীষ্টাব্দ) ফা-ইয়ং (৪২০ খ্রীষ্টাব্দ), হিউয়ান সাং (৬২৯ খ্রীষ্টাব্দ), ই-চিং (৬৭২ খ্রীষ্টাব্দ), উ-খোং (৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রমুখ চীনা বৌদ্ধ শ্রমণগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন।

উপরোক্ত চীনা পরিব্রাজকদের মধ্যে হিউয়ান সাং-এর নাম পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে উভয়দেশে এখনও পর্য্যন্ত পরিকীর্ত্তিত হয়ে থাকে। হিউয়ান সাং ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশ হতে এশিয়ার উত্তরাঞ্চলের পথে ভারতবর্ষ-অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ভারতবর্ষে প্রায় ১৪ বৎসরকাল অবস্থান করেন এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। তিনি নালন্দা মহাবিহারে পণ্ডিতাগ্রগণ্য শীলভদ্রের নিকট গভীরভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনসমূহ শিক্ষা করেন। তাঁর অনুরোধে সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন ও চীনসম্রাটের মধ্যে দূতের আদানপ্রদান সম্ভবপর হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার পথে স্বদেশে ফিরে এসে হিউয়ান সাং প্রায় সতেরো (১৭) বৎসর পরিশ্রম করে ৭২ খানি বৌদ্ধশাস্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। চীনসম্রাটের আদেশে হিউয়ান সাং "সি-ইয়ু-কি" বা পশ্চিম জগতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন এবং এ থেকে তদানীন্তন ভারত সম্বন্ধে আমরা একটি বিশিষ্ট ধারণা করতে পারি।

পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য চীনাপরিব্রাজক হচ্ছেন ই-চিং বা ইৎ-সিং। ইনি ৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-অভিমুখে যাত্রা করেন ও ভারত পরিদর্শনান্তে ৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি ৬৭৫-৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বৎসর নালন্দা মহাবিহারে অবস্থান করেন। ইনি সমুদ্রপথে দুইবার যাতায়াত করেছিলেন। হিউয়ান সাং-এর পর এবং তাঁর ভারতে আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে সমাগত ৫৬ জন চীনা পরিব্রাজকদের ভারত-ভ্রমণ সম্বন্ধে ই চিং "কাউ-ফা-কাঙ-সাং-চুয়েন" বা বিখ্যাত চীনাশ্রমণদের ভারতভ্রমণ-নামক একটী গ্রন্থ রচনা করেন। ই-চিং স্বকীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে ভারতের ভিক্ষুদের আচার ও নিয়মাদির বর্ণনা ছাড়া এখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নি।

এইরূপে বিখ্যাত পরিব্রাজক ও পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় ভারত ও চীনদেশের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

পরিব্রাজকপ্রবর ফা-হিয়েন-লিখিত "ফো-কিউ-কি" অর্থাৎ বুদ্ধভূমির বিবরণ এ পর্য্যন্ত বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবেল রেমুসা (Abel Remusat), ক্ল্যাপরথ (Klaproth) ও লঁ্যাদ্রেস (Landresse) কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় ইহার প্রথম অনুবাদ করেন মিঃ এস বিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ এইচ এ গাইল্‌স ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জেমস লেগে এর অপর একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ গাইল্‌স তৎকৃত অনুবাদের একটি পরিমার্জ্জিত সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভগবান তথাগতের নির্ব্বাণের ২৫০০ বৎসরপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে পিকিংস্থ "সান সি বৌদ্ধসংস্থার" উদ্যোগে লি-য়ুং-সি (Li-yung-hsi) ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদ করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ জেমস লেগে-কৃত ইংরাজী অনুবাদকেই বিশেষ প্রামাণ্য অনুবাদ বলে অভিহিত করেছেন। সেইজন্য

বর্ত্তমান বঙ্গানুবাদের ভিত্তি হিসাবে মিঃ লেগের অনুবাদকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই বঙ্গানুবাদটি মাসিক "প্রবাসী" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ১৩৬৪ সালের ভাদ্র থেকে কার্ত্তিক সংখ্যাত্রয়ে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উহা পুস্তকাকারে প্রকাশের উপদেশ দিয়েছেন। পুস্তকটীর প্রকাশনার ভার গ্রহণ করায় এক্ষণে শ্রী কে, এল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুবাদকের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। ইতি

রাম নবমী
১১ ই চৈত্র, ১৩৬৭

অনুবাদক

প্রথম পরিচ্ছেদ

হান১ (Han-বর্ত্তমান চীন) দেশের অন্তর্গত চ্যাংগান২ শহরের অধিবাসী বৌদ্ধশাস্ত্র-অনুসন্ধিৎসু চীনা শ্রমণ ফা-হিয়েন৩ ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুসহ ভারতপরিভ্রমণের এক সঙ্কল্প করেন—উদ্দেশ্য ভারতের বৌদ্ধতীর্থস্থানগুলি দর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্মানুশাসনসমূহের অনুসন্ধান করা এবং যদি সম্ভব হয় ঐসব অনুশাসনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করা। তাঁর মতে চীনদেশের প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনসূত্রাবলী ও বিহার৪ জীবনযাত্রার নিয়মাবলী শুধুমাত্র অশুদ্ধিকরই নয় অসম্পূর্ণও বটে; তাই

১। ফা-হিয়েন যখনই চীন সম্বন্ধে কোন উক্তি করেছেন তখনই তিনি চীনকে 'হান' নামেই উল্লেখ করেছেন। আসলে এটি চীনের একটি বিশিষ্ট রাজবংশের নাম। প্রায় ৫ শত বৎসর ধরে এই রাজবংশের উত্তরাধিকারীরা চীনদেশ শাসন করেছিলেন (Travels of Fa-hien by Legge)।

২। চ্যাংগান এখনও 'সেন্‌সি' রাজ্যের একটি প্রধান শহরের নাম। প্রথমে এই শহরটি 'হান' রাজবংশের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০২ থেকে ২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) এবং পরে 'সুয়ে' রাজবংশের রাজত্বকালে (৫৮৯ থেকে ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) চীনের রাজধানী ছিল। 'টি-সিন' রাজবংশের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল মানকিং-এ অথবা তারই কাছাকাছি কোন স্থানে এবং চ্যাংগান এই সময় তিনটি রাজ্যের রাজধানীরূপেই খ্যাতিলাভ করেছিল (Travels of Fa-hien by Legge)।

৩। ফা-হিয়েনের আসল নাম ছিল 'কুঙ্গ' এবং তিন বৎসর বয়সেবৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হবার পরই তাঁর ফা-হিয়েন নামকরণ হয়।

(A Record of the Buddhist Countries—Li-yung-hsi, p.8.)

তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের আদি প্রচারক্ষেত্র ভারতভূমি থেকে সম্পূর্ণ ধর্ম্মানুশাসনগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে সেগুলিকে চীনা ভাষায় অনুবাদপূর্ব্বক স্বদেশে প্রচার করার সঙ্কল্প করেন যাতে করে তাঁর স্বদেশবাসী নির্ভুল পথে ভগবান বুদ্ধের অনুগামী হতে সক্ষম হন ও তথাগতের কৃপারাশি থেকে বঞ্চিত না হন। কিন্তু শুধু সঙ্কল্প করলেই ত হল না, সেটা কার্য্যে রূপান্তরিত করা চাই। তাঁর সতীর্থদের মধ্যে হুই-চিং, তাও-চিং, হুই হিং ও হুই-ওয়েই ৫ এই মহান্ সঙ্কল্পের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে এগিয়ে এলেন তাঁকে সাহায্য করতে এবং ভারততীর্থযাত্রায় তাঁর সঙ্গী হতে রাজী হলেন। অবশেষে 'চী-হাই' বর্ষপরিক্রমায় 'হাংশীর' প্রথম বৎসরের (৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে) এক শুভ প্রভাতে ফা-হিয়েন তাঁর উপরোক্ত চারিজন সতীর্থসহ চ্যাংগান থেকে সুদূর ভারতবর্ষের অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা সুরু করলেন।

৪। বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণেরা যেখানে সংসার ত্যাগ করে এসে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও ভগবান বুদ্ধের সাধনভজনে ব্রতী হন এবং বসবাস করেন সেই গৃহকে 'বিহার' বলা হয়। বিহারগুলি সাধারণতঃ দেশের রাজারাই নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক বিহারের অধিবাসীদের (ভিক্ষু বা শ্রমণদের) খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বিহারে সাধারণতঃ বুদ্ধমূর্ত্তির উপাসনা-গৃহ, অধ্যয়ন-গৃহ, ভোজনাগার, ও ভিক্ষুদের শয়নগৃহ থাকে। বিহারের গাম্ভীর্য্য বজায় রাখবার মানসে বিহারের চারিদিক ঘিরে একটি বাগান থাকে। ভিক্ষু ব্যতিরেকে কাউকেই এখানে থাকতে দেওয়া হয় না। সংস্কৃত ভাষায় বিহারকে 'সংঘারাম' অর্থাৎ 'মিলনের ক্ষেত্র' বলা হয়।

৫। ফা-হিয়েনের মত এঁদেরও এগুলি আসল নাম নয়, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের পর এঁদের এই নূতন নামকরণ হয়।

(Travels of Fa-hien by Legge p. 10)

চ্যাংগান ছেড়ে লুং পর্ব্বতমালাকে৬ পিছনে ফেলে তীর্থযাত্রীদল যখন কিনকুই রাজ্যের রাজধানীতে এসে পৌঁছলেন তখন 'গ্রীষ্মকালীন বর্ষাবসান' কাল৭ আগতপ্রায়। উপায়ান্তর না দেখে সেখানেই তীর্থযাত্রীরা 'বর্ষাবসান কাল' অতিবাহিত করে সেখান থেকে যাত্রা করেন। ইয়াংলো পর্ব্বত পার হয়ে যখন তাঁরা সামরিক শহর চাংহেতে এসে পৌঁছলেন তখন সেখানকার পথঘাটের অবস্থা খুবই বিপদসঙ্কুল ছিল। নিঃসম্বল তীর্থযাত্রীদের সাহায্যার্থে এ দেশের রাজা তুয়ান ইয়ে এগিয়ে এলেন এবং 'দানপতির'৮ ভূমিকা গ্রহণ করে এঁদের থাকা খাওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব নিজেই মাথা পেতে নিলেন। এখানে থাকাকালেই ফা-হিয়েনরা চীন থেকে আগত অপর একটি তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে মিলিত হন। এঁরাও একই পথের পথিক, অর্থাৎ

৬। 'সেনসি'র পশ্চিম ও কানসুর পূর্ব্বদিক জুড়ে রয়েছে এই লুং পর্ব্বতমালা। বর্ত্তমানে এই পর্ব্বতমালা 'লংচো' বলেই খ্যাত।
(Travels of Fa-hien by Legge p. 10)

৭। ভিক্ষুদের সাধারণতঃ বর্ষাকালে বিহারের মধ্যে থেকেই সাধনভজন করতে হবে এরূপ একটি নিয়ম বৌদ্ধদের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত আছে। চীনা শ্রমণরা এই বর্ষাকালকে ঠিক ভারতীয় বৌদ্ধ পঞ্জিকার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালেই এটি পালন করে থাকেন, কারণ চীন দেশে অনুরূপ সময়ে গ্রীষ্মকাল।
(Travels of Fa-hien, p. 10)

৮। বৌদ্ধদের মতে ধর্ম্মার্থে কিছু দেওয়ার নামই দান। ছয়টি 'পারমিতা' অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভের উপায়ের মধ্যে 'দান' হচ্ছে সর্ব্বপ্রথম উপায় এবং 'দানপতি' হচ্ছেন তিনিই, যিনি মর্ত্ত্যের দুঃখসাগর পার হবার নিমিত্ত দান করার অভ্যাস রেখেছেন। যেসব লোক দান করে বিহারের অধিবাসীদের ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করেন তাঁদের সম্মানজনক উপাধি হিসাবে এটিকে ধরা হয়।
(Travels of Fa-hien, p. 11)

এঁরাও ভারততীর্থ-দর্শনের অভিলাষী। এই নূতন দলের মধ্যে ছিলেন চে-ইয়েন, হুই-চিয়েন, সেং-সাও, পাও-ইউন এবং সেং-চিং৯। এখান থেকে দুই দলই একত্রে যাত্রা করে এসে পৌঁছলেন সীমান্তবর্ত্তী সামরিক গুরুত্বপূর্ণ প্রধান শহর তুন হোয়াং-এ১০। শহরটির বিস্তার পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৮০ 'লী' ও উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪০ 'লী'১১। তীর্থযাত্রীরা এখানে সানন্দে প্রায় মাসাবধিকাল কাটান। এরপর ফা-হিয়েন ও তাঁর সতীর্থেরা আবার পথে পা বাড়ালেন, কিন্তু অপর দলটি এখানে আরও কিছুদিন কাটিয়ে যাওয়া স্থির করায় এইখানেই রয়ে গেলেন।

তীর্থযাত্রীদের দুর্গম পথযাত্রা সুরু হল এখান থেকেই, কারণ এবার তাঁদের চলতে হবে মরুভূমির উপর দিয়ে (গোবি মরুভূমি)। তুন হোয়াং -এর শাসনকর্ত্তা লী হাও১২ অবশ্য এই দুঃসাহসী শ্রমণদের মরুভূমি অতিক্রম করবার উপযুক্ত প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করে দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তীর্থযাত্রীরা প্রথমে এক জন ভাল পথ-প্রদর্শকের সন্ধান করেছিলেন, কিন্তু পান নি—অবশ্য এতে তীর্থযাত্রীরা বিন্দুমাত্র দমেন নি, কারণ যে মহান সঙ্কল্প নিয়ে তাঁরা মাতৃভূমি ছেড়ে বেরিয়েছেন তা থেকে তাঁদের নিবৃত্ত করতে পারে এমন কোন বাধাই নেই। এই বিস্তীর্ণ মরুতে নেই কোন

৯। এই কয়জন সঙ্গীর মধ্যে পাও-ইউনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারত থেকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে অনেক সংস্কৃত পুস্তকাদির চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, যার মধ্যে মাত্র একখানি পুস্তক এখনও বর্ত্তমান।

১০। চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের সীমান্তে 'গান-সি' প্রদেশের একটি জেলার নাম এখনও তুন-হোয়াং আছে। (Travels of Fa-hien p. 11)

১১। এক 'লী' পথ হচ্ছে এক মাইলের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৫৮৬ গজ।

১২। লী-হাও 'লুংসি'র অধিবাসী। তিনি 'হুয়াং'দের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং শেষে তিনি পশ্চিম লিং-এর ডিউক পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। ইনি যেমন বিদ্বান ছিলেন, তেমনি দয়ালু ছিলেন (Travels of Fa-hien, p. 12)।

পথের চিহ্ন, নেই কোন সীমানা, আছে শুধু পূর্ব্ববর্ত্তী পথিকদের ক্রমশঃ অগ্রগতির চিহ্নস্বরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কঙ্কাল। সেই কঙ্কালসমূহের নিশানা ধরে অভিযাত্রীরা বাঁধনহারা ছন্দহারা হয়ে এগিয়ে যান।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মরুপথের প্রথম পর্ব্ব শেষ হল। তীর্থযাত্রীরা ১৫০০ লী মরুপথ অতিক্রম করে সতের দিন পর পাহাড়-ঘেরা রুক্ষ অনুর্ব্বর শেন্ শেন্[১] রাজ্যের রাজধানীতে এসে পৌঁছান। এদেশের রাজা নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং তাঁর সারা রাজ্য জুড়ে প্রায় ৪০০০ ভিক্ষুর[২] বাস। এঁরা সকলেই হীনযানপন্থী[৩]। এখানকার অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিধান-পদ্ধতির সঙ্গে

১। Mr Wylie—Journal of the Anthropological Institute—Aug., 1880তে বলেছেন যে, যদিও আমরা শেন্ শেন্-এর সঠিক স্থান নির্ণয় করতে পারি নি তা হলেও এমন প্রমাণ পেয়েছি যাতে বলতে পারা যায় যে, এটি 'লব লেক'-এর নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হবে।

২। যে সব ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হয়ে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের পর বিহার-জীবন যাপন করেন তাঁদেরই 'ভিক্ষু' বলা হয়। চীনদেশে এঁদেরই শ্রমণ বলা হয়ে থাকে।

৩। বৌদ্ধধর্ম্মের দুইটি মুখ্য ভাগ আছে, একটি হীনযান ও অপরটি মহাযান। কালক্রমে এই দুইটি যান প্রায় দুইটি বিভিন্ন ধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। হীনযান পুরাতন এবং মহাযান আধুনিক। হীনযান বুদ্ধের বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মহাযানের প্রতিষ্ঠা দার্শনিক ভিত্তির উপর। এই দুইটি যানের ভিতর নানারূপ বিভেদ আছে। হীনযানে নিজের মুক্তিই প্রধান লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু মহাযানে নিজের মুক্তির স্থান নেই। জগতের সকল মনুষ্য, পশু, পক্ষী, ইত্যাদির মুক্তি আগে, তারপর নিজের মুক্তি। মহাযানে দেবদেবীর বালাই নেই। হীনযানে কিছু কিছু হিন্দু দেবতার নাম পাওয়া যায়। বুদ্ধ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন সেই সময় ইন্দ্র ও ব্রহ্মা এসে সেই দিব্যজ্ঞান পৃথিবীতে প্রচার করতে অনুরোধ করেন (বৌদ্ধদের দেবদেবী—শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য. পৃষ্ঠা-১০)।

চীনদেশের প্রচলিত পদ্ধতির কোন তফাৎই নেই। তীর্থযাত্রীরা আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতীয় বৌদ্ধরা যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে ও নিভু´লভাবে ধর্ম্মানুশাসনগুলি মেনে চলেন, ঠিক ততখানি নিষ্ঠার সঙ্গে এদেশের বুদ্ধ-অনুগামীরা তা অনুসরণ করেন না। শুধু এখানেই নয়, এটা তীর্থযাত্রীরা তাঁদের যাত্রাপথের অন্যান্য স্থানগুলিতেও লক্ষ্য করেছেন। এখানকার বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা অবশ্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করছেন এবং সেই ভাষার মাধ্যমেই অনুশাসনগুলি অধ্যয়ন করে থাকেন।

মরুপথশ্রান্ত তীর্থযাত্রীরা এখানে প্রায় মাসাবধিকাল বিশ্রামলাভের পর এখান থেকে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করে ষোল দিনের মাথায় এসে পৌঁছলেন উইদের[৪] দেশে। এখানকার ৪০০০ হীনযানপন্থী ভিক্ষু বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গেই বিহারজীবনযাপনের নিয়মাবলী পালন করে থাকেন, তাই তাঁরা এই চীনা তীর্থযাত্রীদের প্রথমে তাঁদের বিহারে স্থান দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না, কারণ তাঁদের ধারণা এই ছিল যে, চীনা শ্রমণেরা তাঁদের নিয়মাবলী মেনে চলতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত এখানকার বিহারের অধিবাসী এক চীনা শ্রমণ ফোকুন্-সুন্-এর মধ্যস্থতায় তীর্থযাত্রীরা এখানে দুই মাস থাকবার অনুমতি লাভ করেন। এই বিহারে অবস্থানকালেই পাও-ইউন ও তাঁর সতীর্থেরা আবার এসে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হন। বিহারে থাকবার অনুমতি পেলেও তীর্থযাত্রীরা উই-এর অধিবাসীদের কাছ থেকে খুব ভাল ব্যবহার পান নি, কারণ তাঁরা সদাসর্ব্বদাই এদের ঘৃণার চক্ষেই দেখতেন, এমন কি ভিক্ষুর মর্য্যাদায় আঘাত করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাঁদের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত চেন-

৪। Watters তাঁর 'China Review'-তে বলেছেন (p. 115) যে, উই হয় কারসার কিংবা সেখান থেকে কুৎসচার মধ্যবর্ত্তী কোন অঞ্চলের নাম। Li-yung-hsi তাঁর Record of Buddhist Countries by Fa-hien-এ উইকে 'অগ্নিদেশ' বলে উল্লেখ করেছেন (p. 17)।

ইয়েন, হুই-চিং এবং হুই-উয়েই এখান থেকে আবার কাও চাং (বর্ত্তমান কারসারে) ফিরে যান। তাঁরা ঠিক করেন যে, কাও চাং থেকেই তাঁরা যাত্রাপথের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে পুনরায় তাঁদের যাত্রা সুরু করবেন; অর্থাৎ মরুভূমির দ্বিতীয় পর্ব্ব অতিক্রম করবেন। ফা-হিয়েন ও অন্যান্য যাত্রীরা অবশ্য ফো-কুন সুন-এর সহায়তায় এখানেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে যাত্রা করলেন। যাত্রীরা যতই সামনের দিকে এগোতে লাগলেন ততই পথের রুক্ষতা অনুভব করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন প্রাকৃতিক আবহাওয়ার দুর্যোগ। ক্রমশঃ যাত্রীদের পথ থেকে লোকালয়ের চিহ্ন গেল মিলিয়ে, সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেল জীবন্ত মানুষের সংস্পর্শ। মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেবল এগিয়ে চলেছেন সহায়হীন, সম্বলহীন নিঃশঙ্কচিত্ত মাত্র কয়টি দুঃসাহসী পথিক। একমাস পাঁচ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী হয়ে যাত্রীরা এসে পৌঁছলেন খোটানে। যে কষ্ট স্বীকার করে এঁরা মরু জয় করেছেন তা মানুষের ইতিহাসে কখন কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঐশ্বর্য্যময় খোটান শুধু প্রাকৃতিক সম্পদেই সমৃদ্ধ নয়, এর অধিবাসীরাও সবাই বিত্তশালী। বোধ হয় ভগবান বুদ্ধের অনুগামী বলেই সুখী সমৃদ্ধ এক বৃহৎ পরিবারের মত এঁরা শান্তিতেই আছেন। এখানে মহাযানপন্থী ভিক্ষুর সংখ্যা হয়ত কয়েক লক্ষেরও বেশী। বৌদ্ধধর্ম্মানুশাসন অনুসারে এঁরা প্রত্যেকেই সাধারণ শস্যভাণ্ডার থেকে সম্বৎসরের খাদ্যশস্যাদি পেয়ে থাকেন। এঁদের ঘর-বাড়ীগুলো বেশ ছাড়াছাড়া ও সুন্দর করে সাজানো-গোছানো। প্রত্যেক বাড়ীর সামনেই বহিরাগত ভিক্ষুদের থাকার জন্য একটা করে স্তূপাকৃতি ঘর করে দেওয়া আছে, যেখানে গৃহস্থেরা ভিক্ষুদের অভ্যর্থনা করে থাকেন। ফা-হিয়েন ও তাঁর সতীর্থরা এদেশে পৌঁছলে পর এদেশের রাজা নিজেই তাঁদের গোমতী ১ বিহারে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেন। এই বিহারে প্রায় তিন হাজার মহাযানপন্থী ভিক্ষু বাস করেন। এঁদের বিহার-নিয়মাবলীর মধ্যে ফা-হিয়েনের সবচেয়ে যা ভাল লেগেছিল তা হচ্ছে—খাওয়া-দাওয়ার নিয়মটি। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বিহারের অধিবাসী ভিক্ষুরা সবাই ভোজনগৃহে এসে উপস্থিত হন এবং যে যাঁর নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন। আসনগুলি সাধারণতঃ ভিক্ষুদের কৌলীন্য ও পদমর্য্যাদা অনুযায়ী পাতা হয়ে থাকে। সকলে আসন গ্রহণ করলে পর খাদ্যবস্তু সরবরাহ করা হয়। যদি কারুর কোন বাড়তি খাদ্যের দরকার হয় তা হলে তিনি হাতের ইশারায় পরিবেশকদের ডেকে তার প্রয়োজনীয় বিশেষ খাদ্যটি দিতে ইঙ্গিত করেন—কোনরূপ চেঁচামেচি না করেই। সারা ভোজনগৃহে বেশ একটা গম্ভীর পরিবেশ বজায় থাকে—এমন কি ভিক্ষুর আনুষঙ্গিক বাসন-কোশনের কোনরূপ শব্দ করাও নিয়মবিরুদ্ধ।

১। এই বিহারের নাম গোমতী দেওয়ার কারণ বোধ হয় এখানে অনেক গরুও থাকত (Travels of Fa-hien p. 17)।

এখানে প্রতি বৎসরের চতুর্থ মাসে একটা মূর্ত্তি-শোভাযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শুনে তীর্থযাত্রীদের অনেকেই সেই উৎসব দেখে যাবেন বলে খোটানে আরো তিন মাস কাটিয়ে যাওয়া স্থির করলেন। কেবলমাত্র হুই-চিং, তাও-চিং ও হুই-ইং দলের অভিযাত্রীরূপে খালচা২ অভিমুখে আগাম চলে গেলেন। নগরীর অধিবাসীবৃন্দ চতুর্থ মাসের প্রথম দিন থেকেই নগরীর রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে সুরু করেন। রাস্তাঘাট বেশ ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে মুছে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে ফেলা হয়, এমন কি নগরীর অলিগলিগুলোও বাদ যায় না। এর পর সুরু হয়, সাজানোর পালা। নগরদ্বারে একটা বিরাট তাঁবু ফেলা হয় এবং তাঁবুটাকে যতদূর সম্ভব সুন্দর করে সাজানো হয়। উৎসবকালে এই তাঁবুতেই দেশের রাজারাণী ও সম্ভ্রান্ত মহিলারা এসে সাময়িকভাবে বাস করেন।

গোমতী বিহারের ভিক্ষুরা মহাযানপন্থী বলে শোভাযাত্রার আগে যাবার অধিকার পান। নগরীর উপকণ্ঠে এই ভিক্ষুরা চারপায়ার একটা বিরাট রথ তৈরী করে সপ্তরত্ন দিয়ে বেশ সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রথের উপর মূর্ত্তি-গুলিকে রাখেন। রথটা উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুটেরও বেশী আর দেখতে অনেকটা চৈত্যের মতন। ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তিটি রথের ঠিক মাঝখানে রাখা হয় ও তার দু'পাশে দুইটি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি বসানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন দেবগণের মূর্ত্তিও বেশ সুন্দর করে রথের চারধারে সাজিয়ে বসানো হয়। রথটিকে সোনারূপা দিয়ে প্রায় মুড়েই ফেলা হয়। রথ যখন নগরদ্বারের একশ'

২। খালচার নাম ও তার অবস্থান নির্ণয় সঠিকভাবে করতে পারা যায় নি। এ বিষয়ে মতান্তর আছে। ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-কাহিনীর ফরাসী অনুবাদক Remusat বলেছেন, এটা সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কাশ্মীর। Klaproth বলেন, ইসকারডু Beal-এর মতে কাবত চৌ ও Legge-এর মতে এটা সম্ভবতঃ ল্যাডাক কিংবা এরই অঞ্চলভুক্ত কোন স্থানের নাম। Li-yung-hsi বলেছেন এটি খালচা।

হাতের মধ্যে এসে পড়ে তখন রাজা তাঁর বেশভূষা পরিবর্ত্তন করে রাজমুকুট খুলে ফেলে খালি পায়ে ফুল ও ধূপধুনো নিয়ে রথের দিকে এগিয়ে যান। [illegible] সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানিবেদনের পর রাজা রথের চারদিকে ফুল ছড়িয়ে ধূপধুনো জালিয়ে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে পূজা করেন। রথটি যখন নগরদ্বার অতিক্রম করতে থাকে তখন রাণী ও তাঁর সঙ্গী মহিলারা রথমধ্যস্থিত মূর্ত্তির উদ্দেশ্যে অফুরন্ত পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকেন। এই-ভাবেই এক শান্ত আনন্দ-উচ্ছল পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক বিহারের মূর্ত্তি-শোভাযাত্রার জন্য একটা করে দিন নির্দ্দিষ্ট করা থাকে এবং মাসের পয়লা থেকে সুরু হয়ে ১৪ই তারিখে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটলে পর রাজা ও রাণী প্রাসাদে ফিরে যান।

এ দেশের রাজা নগরের প্রায় ৮ লী পশ্চিমে সম্প্রতি একটি নূতন বিহারের নির্ম্মাণকার্য্য সমাপ্ত করেছেন। বিহারটি নির্ম্মাণ করতে সময় লেগেছে প্রায় ৮০ বৎসর অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজার ঠাকুরদা এর ভিত তৈরি করে গেছলেন, আর ইনি সেটা সম্পূর্ণ করলেন। ২৫০ ফুট উঁচু এই নবনির্ম্মিত বিহারটি স্থাপত্য-শিল্পের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সবচেয়ে সুন্দর এর খোদাইয়ের কাজগুলি। বিহারের ভিতরটায় সোনারূপা ও অন্যান্য রত্ন দিয়ে যে কারুকার্য্য করা হয়েছে তা সত্যই অপূর্ব্ব। এর মধ্যে একটি স্তূপও৩ নির্ম্মিত হয়েছে যার পিছন দিকে

৩। কোন শ্রদ্ধেয় অর্হৎ, ভিক্ষু, বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধদেবের দেহাংশ বা তাদের পূতাস্থি নিয়ে সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা একটি করে সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বৌদ্ধেরা এই সব সমাধিমন্দিরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণপূর্ব্বক তাঁদের স্মরণ করে থাকেন। এই সমাধি স্মরণিক মন্দিরগুলিকে স্তূপ বলা হয়। সাধারণতঃ এর উপরিভাগ গোলাকৃতি। বৌদ্ধরা অনেক ক্ষেত্রে স্তূপ রচনা করেছেন যার নীচে কোন পূতাস্থিই নেই, বুদ্ধের কোন বিশেষ ঘটনাস্থলকে স্মরণ করেই সেইগুলি নির্ম্মাণ করা হয়েছে যা এই বিবরণীর অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাবে—অনুবাদক।

একটা প্রার্থনাগৃহও আছে। এই গৃহের কড়িকাঠ থেকে স্থরু করে জানালা-দরজা ও স্তম্ভগুলি পর্য্যন্ত সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিহারে ভিক্ষুদের বাসগৃহগুলি এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে যার চমৎকারিত্ব বর্ণনা করতে ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। পামীরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছয়টি দেশের রাজারা এই বিহারের জন্য খুব দামী দামী মণিমুক্তা দান করেছেন এবং এর নির্ম্মাণকার্য্যে সাহায্য করেছেন।

মূর্ত্তি-শোভাযাত্রা উৎসব সমাপ্ত হলে পর ফা-হিয়েন ও সেং-শাও বাদে তাঁর অপর সঙ্গীরা এখান থেকে চাকুকার (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান ইয়ারখন্দ) দিকে অগ্রসর হন এবং প্রায় পনের দিন পরে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন। অপরদিকে সেং-শাও অন্য একজন বিদেশী শ্রমণের সঙ্গে কোপে হেনির (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল শহর) দিকে যাত্রা করেন।

ফা-হিয়েনরা চাকুকার এসে দেখেন যে, সেখানেও প্রায় এক হাজার মহাযানপন্থী ভিক্ষুর বাস। এখানকার রাজাও বুদ্ধের একজন প্রধান ভক্ত। এখানে ১৫ দিন থাকবার পর পুনরায় যাত্রা করে তীর্থযাত্রীরা পামীরের মধ্য দিয়ে চার দিন ধরে পথ চলার পর আগজীদের দেশে এসে পৌঁছেন। গ্রীষ্মকালীন বর্ষাবসানকাল এখানে কাটিয়ে তীর্থযাত্রীরা উত্তরদিকে এগোতে থাকেন এবং প্রায় ২৫ দিনের মাথায় খালচা এসে পৌঁছেন। এখানে এসেই ফা-হিয়েন তাঁর সতীর্থ হুই-চিং, হুই-ওয়ে ও চে-ইয়েন-এর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন।
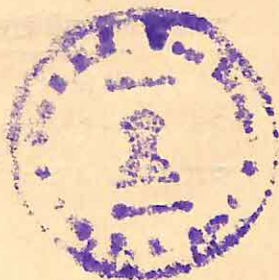
চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রীরা যখন খাল্চায় এসে পৌঁছেন তখন সৌভাগ্যবশতঃ সেখানে 'মহাপঞ্চবার্ষিকী সভা' অনুষ্ঠানের তোড়জোড় চলছে। এই মহাসভায় এ রাজ্যের প্রায় সমস্ত বৌদ্ধভিক্ষু যোগদান করেন। ভিক্ষুগণ যখন বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে এসে সমবেত হন তখন দেশের রাজা তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বিশেষভবে নির্ম্মিত ও সজ্জিত সভামণ্ডপে নিয়ে যান। সভামণ্ডপে শুধু মাদুর বিছিয়ে দিয়ে তার উপরই ভিক্ষুদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ এই সভা বসন্তকালের প্রথম তিন মাসের যে-কোন একটি মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুদের প্রতি রাজার শ্রদ্ধানিবেদনের পর রাজা তাঁর মন্ত্রী-বর্গকে অনুরূপ শ্রদ্ধা জানাবার নির্দ্দেশ দেন। শ্রদ্ধানিবেদনের পালা শেষ হলে পর রাজা তাঁর মন্ত্রীবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী সমভিব্যাহারে একটি সাদা পশমের কাপড় পরে ভিক্ষুদের মধ্যে তাঁদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সেই সঙ্গে দামী দামী মণি-মাণিক্যাদি বণ্টন করে দেন। দান সমাপ্ত হলে পর রাজা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্যাদি পুনরায় ভিক্ষুদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন।

চিরতুষারাবৃত এই পার্বত্য অঞ্চলে যে সমস্ত শস্যাদি উৎপন্ন হয় তার মধ্যে একমাত্র গমই পাকে। রাজা উপস্থিত ভিক্ষুদের সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় শস্যাদি দান করে পরে সাধারণভাবে অনুরোধ করেন যে, তাঁদের বিশেষ শক্তিবলে এই গম পাকিয়ে নিয়ে তবে যেন তাঁরা সেগুলি গ্রহণ করেন।১

ভগবান বুদ্ধের ব্যবহৃত প্রস্তরনির্ম্মিত পিক্দানীটি এখানেই আছে; আর আছে বুদ্ধের একটি দাঁত। বুদ্ধের এই পূতাস্থির উপর একটি স্তূপও নির্ম্মিত

১। Watters-এর মতে খালচার ভিক্ষুদের পবনবিজয়ের বিশেষ ক্ষমতা ছিল সেইজন্যই তাঁদের খাদ্যশস্যাদি সুপক্ক করে নিয়ে গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করা হত—(Travels of Fa-hien)।

হয়েছে। স্তূপের আশেপাশে হাজার ভিক্ষুর বাস। এখানকার ভিক্ষুরা যেসব নিয়মাবলী মেনে চলেন তা সত্যই চমকপ্রদ, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় এত বেশী যে, এ কাহিনীতে তা বিবৃত করা সম্ভব নয়। খাল্‌চা পামীরের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল এবং এখান থেকে যতই পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া যাবে ততই চীন-দেশের সঙ্গে সেখানকার সর্ব্ববিষয়ে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাবে। চীনদেশের সহিত তখন এ দেশের মিল পাওয়া যাবে মাত্র বাঁশ, বেদানা ও ইক্ষু গাছের মধ্যে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ উত্তর ভারতের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকেন। তুষারাবৃত পামীর পার হতে তীর্থযাত্রীদের সময় লাগল প্রায় একমাস। এই পামীরের পথ এতই বিপদসঙ্কুল যে, দশ হাজারের মধ্যে বোধ হয় একজন পথিকও ফিরে আসতে পারে না। এখানকার পথে এক অদ্ভুত ধরনের সাপ দেখতে পাওয়া যায়, তারা রেগে গেলে তাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস এত জোর বইতে থাকে যে, তাদের অবস্থান-ক্ষেত্রের বেশ খানিকটা জুড়ে এক বিরাট বালির ঝড় উড়ে যায়। এখানে যারা বাস করে তাদের 'তুষার মানব' বলা হয়। ভগবান তথাগতের সবিশেষ করুণাবশে তীর্থযাত্রীরা নির্ব্বিঘ্নেই এই পথ পেরিয়ে উত্তর ভারতের সীমান্ত রাজ্য দর্দে এসে পৌঁছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তীর্থযাত্রীরা এই হিমের দেশেও অনেক মহাযানপন্থী ভিক্ষুর বাস দেখতে পেয়েছেন। কথিত আছে, এই দেশে বহুপূর্ব্বে একজন অর্হৎ[১] বাস করতেন যিনি তাঁর ঐশ্বরিক শক্তিবলে একজন শিল্পীকে একবার তুষিত স্বর্গে[২] মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের[৩]

১। শুদ্ধাচারী আর্য্যেরা—যাঁরা বৌদ্ধসাধনতন্ত্রের আটটি পথই পার হয়ে ষড়রিপু জয় করেছেন তাঁরাই অর্হৎ-এর পর্য্যায়ভুক্ত হন। সাধারণতঃ অর্হৎরা কতকগুলি ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং তাঁদের পুনরায় বুদ্ধত্ব অর্জ্জন করতে হয় না, কারণ তাঁরা যে নির্ব্বাণের পথ অতিক্রম করে এসেছেন এটা ধরেই নেওয়া হয়। এদের আর মাটির পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না বলেই বৌদ্ধদের বিশ্বাস (Travels of Fa-hien, pp.24-25)।

২। তুষিত স্বর্গকে চতুর্থ দেবলোক বলা হয় যেখানে সব বোধিসত্ত্বই পুনর্জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে বুদ্ধ হয়ে জন্মান। তুষিত স্বর্গে জীবন ৪০০০ বৎসরকাল স্থায়ী, কিন্তু সেখানকার ২৪ ঘণ্টা পৃথিবীর ৪০০ বৎসরের সমান (Travels of Fa-hien p. 25)।

অবয়বের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই শিল্পী পরে পৃথিবীতে ফিরে এসে ঠিক সেই মাপের একটি কাঠের মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি তৈরী করেছিলেন। মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ করবার জন্য শিল্পীকে তিনবার তুষিত স্বর্গে যেতে হয়েছিল। মূর্ত্তিটি উচ্চতায় প্রায় ৮০ ফুট, এর নিচের দিকটা প্রায় ৮ ফুট চওড়া। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ উপবাসের দিনে এই মূর্ত্তি থেকে এক তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হতে দেখা যায়। দেশবিদেশের রাজারাজড়াদের মধ্যে এই মূর্ত্তিটির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা নিয়ে বেশ কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। দর্দের এই মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি তার অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও বিরাজ করছে, মহাকালের স্রোতে তা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়ে যায় নি।

তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে যাত্রা করে ক্রমাগত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। যাত্রীরা এবার এক মহাবিপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য পথের সম্মুখীন হন। প্রায় ১০ হাজার ফুট উঁচু খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে একটি সঙ্কীর্ণ পথ—যার এক পাশে অভ্রভেদী শিলাখণ্ড ও অপর দিকে গভীর খাদ, যার তলদেশ দিয়ে বয়ে গেছে সিন্ধুনদ। এই সঙ্কীর্ণ পথ কতকটা উঁচু দিকে গিয়ে পরে নিচের দিকে নেমে গেছে। পথটি ক্রমশঃ আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে এবং এক এক স্থানে এতই সঙ্কীর্ণ যে, পা ফেলার স্থানটুকুও পাওয়া যায় না, অনেক কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হয়। এই দুর্গম পথে চলার সুবিধার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী পথিকেরা পাহাড় কেটে কেটে সিঁড়ি বানিয়েছেন এবং স্থানে স্থানে যেখানে পথের সংযোগ পাহাড়ের ফাটলের জন্য ছিন্ন হয়ে গেছে—সেখানে কাঠের মই লাগিয়ে দিয়েছেন। এ রকম মইয়ের সংখ্যা প্রায় সাত শত।

৩। বৌদ্ধদের বিশ্বাস মৈত্রেয় এখন বোধিসত্ত্বরূপে তুষিত স্বর্গে বিরাজ করছেন এবং যথাসময়ে তিনি ধরাধামে ভবিষ্যৎ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হবেন। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের রং সোনার মত হলদে এবং ইনি চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ এই দুই রূপেই কল্পিত হন।

(বৌদ্ধদের দেবদেবী—শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য। পৃষ্ঠা ৩০)

পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে তীর্থযাত্রীরা একটা ৮০ হাত লম্বা দড়ির সাঁকোর উপর দিয়ে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে উত্তর ভারতে প্রথম পদক্ষেপ করেন।

তীর্থযাত্রীরা উত্তর ভারতে এসে পৌঁছলে পর এখানকার অধিবাসী শ্রমণেরা ফা-হিয়েনকে জিজ্ঞাসা করেন, পূবের দেশে (অর্থাৎ চীনে) বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রথম প্রচার কখন হয়েছিল? প্রত্যুত্তরে ফা-হিয়েন বলেছিলেন, আমি এ বিষয়ে সেখানকার অধিবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছি যে, বৌদ্ধধর্ম্ম বহুযুগ পূর্ব্বেই সেখানে প্রচারিত হয়েছিল। তাঁরা বলেছেন যে, দর্দে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিস্থাপনের পর বহু ভারতীয় শ্রমণ ভগবান বুদ্ধের অনুশাসনলিপি ও প্রতিকৃতি সঙ্গে নিয়ে সিন্ধুনদ পেরিয়ে পূবের দেশে চলে যান। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের[৪] প্রায় ৩০০ বৎসর পরে মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। ধরে নেওয়া যায়, সমসাময়িক চীনের রাজা পিয়েনের সময় থেকেই পূবের দেশে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সেই-টাই সম্ভবতঃ ঠিক, কারণ রাজা মিং-এর স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হতে পারে না।[৫]

৪। সম্ভবতঃ ফা-হিয়েন এখানে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভ অর্থাৎ মৃত্যুর পরের কথারই উল্লেখ করতে চেয়েছেন।

৫। চীনের রাজা মিং ৬১ খ্রীষ্টাব্দে একদিন রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে একটি জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি দেখতে পেয়েছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলে পর তাঁদের মধ্যে একজন বলেন যে, রাজা স্বপ্নে বুদ্ধদেবকেই দেখেছেন। রাজা তখন পশ্চিমের দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্যানুসন্ধানের জন্য দূত প্রেরণ করেন এবং ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দূতেরা ২ জন শ্রমণকে চীনে নিয়ে যান—যাঁদের প্রচেষ্টাতেই চীনে পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারলাভ ঘটে। (Record of Buddhist kingdoms by Li-yung-hsi, p. 24)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রীরা উত্তর ভারতে পদার্পণ করে প্রথমে এসে পৌঁছেন উড্ডিয়ান[১] রাজ্যের রাজধানীতে, এটা উত্তর ভারতের অন্তর্গত হলেও এখানে মধ্যভারতের ভাষারই চলন। মধ্যভারত বলতে মধ্য রাজ্যকেই বোঝায় এবং বুদ্ধের অনুশাসনগুলি এখানে বহুল-প্রচারিত। সাধারণতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যেখানে পাকাপাকিভাবে বসবাস করেন সে স্থানকে এখানকার অধিবাসীরা 'সংঘারাম'[২] বলে এবং বহিরাগত ভিক্ষুরা যখন এখানে তীর্থভ্রমণে আসেন তখন এই সংঘারামসমূহেই তিন দিনের জন্য তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের নিজেদের বাসস্থান খুঁজে নিতে অনুরোধ করা হয়। তীর্থযাত্রীরা এখানে প্রায় ৫০০ মহাযানপন্থী ভিক্ষুর বাস আছে দেখেছিলেন। এখানে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভগবান বুদ্ধ যখন উত্তর ভারত পরিদর্শনে আসেন তখন এই উড্ডিয়ানই প্রথম তাঁর পাদস্পর্শে ধন্য হয় এবং এখনও পর্য্যন্ত এই প্রবাদের সত্যতা স্থানীয় অধিবাসীরা স্বীকার করেন। বুদ্ধদেব যে শিলাখণ্ডটির উপর তাঁর উত্তরীয়খানি রৌদ্রে শুকোতে দেন সেটিকে এখনও এরা অতি যত্নসহকারে রেখে দিয়েছেন।

তীর্থযাত্রীদের মধ্যে হুই-চিং, তাও-চিং ও হুই-ইং এখান থেকে 'বর্ষাবসান-কালে'র পূর্ব্বেই নগরহার[৩] রাজ্যের যে স্থানে বুদ্ধের প্রতিচ্ছায়া আছে সেই

১। পাঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত বর্ত্তমান সুওয়াত অঞ্চলকে উড্ডিয়ান বলা হত। ফুলকন ও বিভিন্ন গাছের বনে এ অঞ্চল বিখ্যাত।

২। সংস্কৃত ভাষায় বিহারকে 'সংঘারাম' বলা হয়—সম্ভবতঃ ফা-হিয়েন এখানে বিহারেরই উল্লেখ করেছেন।—অনুবাদক।

৩। কাবুল নদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী একটি রাজ্য। বর্ত্তমান জালালাবাদের ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত (Travels of Fa-hien, p 29)।

স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, দলের অপরাপর যাত্রীরা এইখানেই 'বর্ষাবসান-কাল' কাটিয়ে স্থবাস্ত অভিমুখে যাত্রা করেন। কথিত আছে পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে পরীক্ষা করার মানসে একটি বাজপাখী ও একটি ঘুঘুপাখী স্থষ্টি করে বাজপাখীটিকে ঘুঘুপাখীর বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন। বুদ্ধদেব এই দেখে নিজের দেহের খানিকটা মাংস কেটে বাজপাখীটিকে দিয়ে ঘুঘুটির প্রাণভিক্ষা করেন। বুদ্ধত্বলাভের পর যখন তিনি শিষ্য সমভিব্যাহারে এই স্থান পরিদর্শনে আসেন তখন তিনি উপরোক্ত স্থল লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'এখানেই আমি নিজ দেহের মাংসের বিনিময়ে একটি ঘুঘুর জীবন ক্রয় করি।' ভবিষ্যৎ কালে বৌদ্ধধর্ম্মানুগামীরা এখানে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন ও সেটিকে সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে গান্ধারে১ এসে পৌঁছেন। এককালে এই গান্ধার অশোকের পুত্র ধর্ম্মবিবর্দ্ধনের শাসনাধীন ছিল। এইখানেই বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্বের পর্য্যায়ে থাকাকালে একটি অন্ধকে নিজের চক্ষু দান করেছিলেন। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সবাই হীনযানপন্থী বৌদ্ধ। এখান থেকে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয়ে তীর্থযাত্রীরা সাত দিনের দিন তক্ষশীলায়২ এসে পৌঁছেন। কথিত আছে, বুদ্ধদেব যখন বোধিসত্ত্বের পর্য্যায়ে ছিলেন তখন এইখানেই তিনি তাঁর মস্তক একজনকে ভিক্ষাস্বরূপ দান করেছিলেন; সেই কারণেই বোধ হয় এই স্থান তক্ষশীলা নামে পরিচিত হয়েছে। বুদ্ধদেব এখান থেকে কিছু দূরে এক স্থানে একটি ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনীকে খাদ্যস্বরূপ নিজেকে উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের স্মৃতিবিজড়িত উপরোক্ত প্রত্যেকটি স্থানেই একটি করে স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে এবং রাজা-প্রজা নির্ব্বিশেষে সকলেই সেইসব স্তূপে পুষ্প-ধূপাদি দিয়ে পূজা-অর্চ্চনাদি করে আসছেন। তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে যাত্রা করে পুরুষপুরে (বর্ত্তমান পেশোয়ার) এসে পৌঁছেন।

১। Eitel-এর মতে এটি একটি অতি প্রাচীন রাজ্য; ধেরি এবং বানজোর অঞ্চলের মধ্যেই এর অবস্থিতি (Travels of Fa-hien, p. 31)।

২। Eitel-এর মতে গ্রীকদের Taxila বর্ত্তমান হুস্থন আবদলের অঞ্চলভুক্ত। কানিংহাম বলেছেন, এটি বোধ হয় আর্য্যদের Taxila, পাঞ্জাবের উপরিভাগে শাধেরি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যার চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায়, এবং এটি সিন্ধুনদ ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। ফা-হিয়েনের বিবরণীর সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নেই দেখা যায় (Travels of Fa-hien, p. 34)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কথিত আছে, বুদ্ধদেব যখন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে পুরুষপুর পরিদর্শনে আসেন তখন তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে[১] বলেন, "আমার পরিনির্ব্বাণ-লাভের পর কনিষ্ক নামে একজন রাজা এখানে একটা স্তূপ নির্ম্মাণ করবেন।" ভবিষ্যৎকালে যখন রাজা কনিষ্ক এই পুরুষপুরে বেড়াতে আসেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র রাজার মনে স্তূপ নির্ম্মাণের বাসনা জাগাবার উদ্দেশ্যে এক ছোট মেষপালকের ছদ্মবেশ ধরে এসে তাঁর যাত্রাপথের পাশেই একটি ছোট্ট স্তূপ রচনায় নিবিষ্ট হন। যাত্রাকালে রাজার এদিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি বালকটিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কি তৈরি করতে ব্যস্ত? প্রত্যুত্তরে বালকটি জানায় যে, সে বুদ্ধের জন্য একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করছে। রাজা বালকটির কথায় মুগ্ধ হয়ে যান এবং সেইখানেই একটি বড় স্তূপ নির্ম্মাণের বাসনা প্রকাশ করেন। রাজা যে স্তূপটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন সেটি প্রায় ৪০০ ফুট উঁচু। সারা জম্বুদ্বীপে[২] যতগুলি স্তূপ তীর্থযাত্রীরা দেখেছেন তার মধ্যে এটিই স্থাপত্যশিল্পে, কারুকার্য্যে, সৌন্দর্য্যে ও আভিজাত্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ এবং অতুলনীয়।

১। আনন্দ শাক্যমুনির প্রথম ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি শাক্যমুনির বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশাসনের রচনাকালে ইনি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। এঁর সঙ্গে শাক্যমুনির খুব সদ্ভাব ছিল। বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণকালে এঁকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে সেগুলির উল্লেখ আছে। আনন্দ অপর একটি কল্পে এই পৃথিবীতে আবার বুদ্ধ হয়ে জন্মাবেন বলে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন। (Sacred Books of the East, vol. XI. p. 9)

২। 'জম্বুদ্বীপ' চারিটি বিরাট মহাদেশের মধ্যে একটি যেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের খুবই প্রসারলাভ ঘটেছিল। এই দ্বীপের আকার জম্বুগাছের পাতার মত হওয়ার দরুন এর নামকরণ হয়েছে জম্বুদ্বীপ (Travels of Fa-hien p. 36)।

বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্রটিও এই পুরুষপুরেই আছে। কথিত আছে, কোন এক শকরাজা[৩] এক সময় তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই দেশ আক্রমণ করেন ও জয় করেন। রাজা এবং তার অমাত্যবর্গ ভগবান বুদ্ধের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁরা বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটি[৪] এখান থেকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প করেন। যাহা হউক, শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের পর একটি সজ্জিত আধারে ভিক্ষাপাত্রটি নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে একটি হস্তীপৃষ্ঠে রাখা হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আধারটি হস্তীপৃষ্ঠে রাখার সঙ্গে সঙ্গে হস্তীটি বসে পড়ে, শত চেষ্টা করেও তাকে ওঠানো সম্ভব হয় নি। এর পরে একটি চার-চাকার শকটের ওপর এটিকে রেখে আটটি হস্তীকে শকট টানার জন্য জুড়ে দেওয়া হয়, কিন্তু ফল পূর্ব্বের মতই, অর্থাৎ গাড়ীর চাকা একটুও ঘুরল না—আটটি হস্তীতেও নড়াতে পারলে না। দুবার নিষ্ফল চেষ্টার পর রাজা বুঝলেন যে, ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করবার উপযুক্ত সময় তাঁর এখনও আসে নি, তখন তিনি এই স্থানেই একটা স্তূপ ও বিহার নির্ম্মাণ করে দেন। ভিক্ষাপাত্রটির প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবার জন্য একজন রক্ষীও নিয়োগ করে দেন। রাজার এই নবনির্ম্মিত বিহারে এখন প্রায় ৭ হাজারেরও বেশী বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে তাঁরা (ভিক্ষুরা) ভিক্ষাপাত্রটিসহ উপস্থিত হন, সাধারণের সহযোগিতায় স্তূপের বাইরে নিয়ে আসেন ও সেটিকে পূজা-অর্চ্চনা করে তাঁরা মধ্যাহ্নকালীন আহারাদি গ্রহণ করেন। সন্ধ্যাকালেও একবার ভিক্ষাপাত্রটি বাইরে নিয়ে এসে ধূপধুনো জ্বালিয়ে এর প্রতি ভিক্ষুরা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে থাকেন।

চিরদীপ্যমান এই ভিক্ষাপাত্রটিতে[৫] বড়জোর দু'কুন্‌কে চাল ধরবে। এর বাইরের দিকটা নানা রঙে সজ্জিত, তার মধ্যে কালো রঙটাই প্রধান এবং

৩। সম্ভবতঃ রাজা কনিষ্কের কথাই ফা-হিয়েন এখানে উল্লেখ করেছেন।

৪। প্রদত্ত ভিক্ষাপাত্রটি যখন গৌতমের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন পৃথিবীর পরিচালক চারি দেবতা বুদ্ধকে একটি পান্নার তৈরী

এটা প্রায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি মোটা। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গরীব ভক্তজন সামান্যমাত্র পুষ্পও এর মধ্যে অর্পণ করলে এটি আপনা থেকেই ভরে ওঠে, কিন্তু ধনী লোকেরা লক্ষ লক্ষ পুষ্পের ডালি দিয়ে চেষ্টা করলেও এটা ভরাতে সক্ষম হন না।

তীর্থযাত্রীদের মধ্যে পাও-ইউন এবং সেং-চিং ভিক্ষাপাত্রটির প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করার পর স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করেন। দলের অপর তিনজন—যাঁরা ইতিপূর্ব্বেই বুদ্ধের প্রতিচ্ছায়া দর্শনের উদ্দেশ্যে নগরহারের দিকে যাত্রা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফিরে এলেন কেবল হুই-ইং। তিনিও পাও-ইউনের সঙ্গে স্বদেশে ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। অগত্যা সঙ্গীহীন হয়ে ফা-হিয়েন একাকীই হিলো নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ভিক্ষাপাত্র এনে দেন, কিন্তু বুদ্ধদেব তা গ্রহণ করেন নি। এর পর দেবতারা চারিটি পাথরের তৈরী ভিক্ষাপাত্র এনে বুদ্ধের সামনে হাজির করেন এবং বুদ্ধদেব চারিটি ভিক্ষাপাত্র মিলিয়ে একটি ভিক্ষাপাত্রে পরিণত করেন, সেইটাই তিনি গ্রহণ করেন (Travels of Fa-hien, p.35)।

নবম পরিচ্ছেদ

১৬ যোজন১ পথ অতিক্রম করে ফা-হিয়েন নগরহার রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী নগরী হিলোতে এসে পৌঁছেন। এখানকার এক বিহারে বুদ্ধদেবের মস্তকের একটি অস্থি রক্ষিত আছে। অস্থিটি আগাগোড়া সোনা দিয়ে মোড়া ও সপ্তরত্ন দিয়ে বিশেষভাবে সজ্জিত। নগরহারের রাজা বুদ্ধের এই পূতাস্থি যাতে কোন রকমে চুরি না যায় সেই জন্য নগরীর আট জন সম্ভ্রান্ত নাগরিকের ওপর এই বিহারদ্বার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ও এঁদের প্রত্যেককেই একটি করে মোহর দিয়েছেন। এঁরা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বিহারদ্বার রুদ্ধ করে তার ওপর স্ব-স্ব মোহরের ছাপ দিয়ে যান ও অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-স্ব মোহরের ছাপ অটুট আছে কিনা দেখে তার পর পুনরায় দ্বার খোলেন। এর পর সুগন্ধি জলে নিজেদের হাত ধুয়ে পূতাস্থিটি বিহারের বাইরে বের করে এনে মণিমুক্তাখচিত একটি সিংহাসনের উপর রাখেন। পূতাস্থিটি ফিকে হলদে রঙের এবং এর আকৃতি ১২ ইঞ্চি পরিমিত এক গোলাকৃতি বৃত্তের মত ও মধ্যস্থানটা একটু উঁচু। বিহারের বাইরে পূতাস্থি আনার সঙ্গে সঙ্গে বিহার-রক্ষক একটি সু-উচ্চ স্থানে উঠে শাঁখ, কাড়া নাকাড়া প্রভৃতি বাজাতে থাকেন ও রাজা ঐ শব্দ শোনামাত্র বিহারের পূর্ব্ব দিক দিয়ে এসে ফুল ও ধূপাদি দ্বারা পূজাপাঠ সাঙ্গ করে কপালে পূতাস্থিটি একবার ছোঁয়ান। তার পর পশ্চিম দিক দিয়ে

১। এই প্রথম আমরা দেখছি যে, ফা-হিয়েন পথের দূরত্ব যোজন দিয়ে উল্লেখ করছেন। এক যোজন পথ একটি সৈন্যবাহিনীর একদিনের অগ্রগতির সমান দূরে, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে কখন কখন যোজন পাঁচ মাইলের সমদূরত্ববিশিষ্ট বলে উল্লিখিত হয়েছে (Record of Buddhist Kingdom by Li-yung-hsi, p.29)।

প্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যাবলী সুরু করেন। রাজার অনুচরবর্গ এবং বৈশ্যসম্প্রদায়ের প্রধানেরা পূতাস্থির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্ম্মে হাত দেন। এটি প্রতিদিনের ঘটনা এবং এই প্রথা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। সবাইকার পূজা সাঙ্গ হলে পর এটিকে আবার বিহারের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিদিন প্রভাতে বিহারদ্বারে ফুলওয়ালীরা ফুল ও ধূপাদি বিক্রয় করে থাকে। যাঁরা পূজা করতে ইচ্ছুক তাঁরা সেই সব ফুল ও ধূপ কিনে পূজাপাঠ করে থাকেন। প্রায়ই বিভিন্ন দেশের রাজারা তাঁদের দূত মারফত এই পূতাস্থির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যাদি প্রেরণ করে থাকেন। বিহারটি এমন একস্থানে নির্ম্মিত যে, ভূমিকম্প বা বন্যায় পর্য্যন্ত এর কখনই কোন ক্ষতি হবে না।

ফা-হিয়েন এখান থেকে উত্তর দিকে আর এক যোজন দূরে অবস্থিত নগরহারের রাজধানীতে এসে পৌঁছেন। এইখানেই বুদ্ধদেব যখন বোধিসত্ত্বের পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন তখন একবার অর্থ দিয়ে পাঁচটি ফুলের গুচ্ছ ক্রয় করে দীপঙ্কর বুদ্ধের[২] প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন। নগরীর মধ্যস্থানে একটি স্তূপও আছে। সেখানে বুদ্ধের একটি দাঁত রাখা হয়েছে, বুদ্ধদেবের ধাতুমণ্ডিত যষ্টিটি যেখানে রাখা হয়েছে, সেটি রাজধানী থেকে প্রায় এক যোজন দূরে অবস্থিত। যষ্টিটি গোশীর্ষচন্দন কাঠের[৩] তৈরী এবং লম্বায় প্রায় ১৭ ফুট। একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে এটিকে রাখা হয়েছে। বুদ্ধদেবের উত্তরীয়খানিও এখানকার বিহারের মধ্যে রক্ষিত আছে। দেশে যখন খুব জলাভাব দেখা দেয় তখন এখানকার অধিবাসীরা সবাই মিলে বুদ্ধের উত্তরীয়

২। শাক্যমুনির ২৪তম পূর্ব্বের বুদ্ধের নাম ছিল দীপঙ্কর বুদ্ধ।

৩। মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত উলাবুরু পর্ব্বতে চন্দনকাঠ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। পর্ব্বতটি অনেকটা গরুর মাথার মত আকৃতিবিশিষ্ট, বোধ হয় তাই পর্ব্বতটিকে 'গোশীর্ষ পর্ব্বত' বলে ফা-হিয়েন অভিহিত করেছেন। —অনুবাদক।

বিহারের বাইরে নিয়ে এসে পূজা-অর্চ্চনা করে থাকে এবং কিছুক্ষণের পূজা-অর্চ্চনার মধ্যেই প্রবল বৃষ্টি দেখা দেয়।

এখান থেকে দক্ষিণাভিমুখে আধ যোজন এগিয়ে গেলে একটি বিরাট শিলাখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। ১০ হাত দূর থেকে যদি এই শিলাখণ্ডের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা হয় তা হলে তপ্ত কাঞ্চন রঙের বুদ্ধের যেন একটি প্রতিমূর্ত্তি শিলাখণ্ডের গায়ে দেখা যাবে, কিন্তু শিলার যতই নিকটবর্ত্তী হওয়া যাবে মূর্ত্তিটি ততই আবছা হয়ে আসবে এবং মনে হবে যেন পূর্ব্বে দেখা মূর্ত্তিটি একটি কাল্পনিক চিত্র। এর একটি প্রতিচ্ছবি অঙ্কনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের রাজারা তাঁদের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের এখানে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কোন শিল্পীই এই প্রতিচ্ছবিকে তাঁদের তুলিতে রূপ দিতে পারেন নি। প্রবাদ আছে যে, এই শিলাখণ্ডের উপরই এক হাজার বুদ্ধ তাঁদের প্রতিচ্ছায়া রেখে যাবেন। এরই আশেপাশে অসংখ্য স্তূপ রয়েছে, প্রত্যেক স্তূপের পিছনে বুদ্ধের জীবনের কোন-না-কোন অংশের স্মৃতি বিজড়িত—যেমন তাঁর মস্তকমুণ্ডন, নখকর্ত্তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইখানেই বুদ্ধদেব নিজে শিষ্যবর্গের সহায়তায় একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন, সেটি ভবিষ্যৎকালে স্তূপনির্ম্মাণের আদর্শস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পাশেই একটি বিহার নির্ম্মিত হয়েছে—যেখানে ফা-হিয়েন প্রায় সাত হাজার ভিক্ষুকে বসবাস করতে দেখেছিলেন। অর্হৎ[৪] ও প্রত্যেক বুদ্ধের[৫] সম্মানে এখানে প্রায় এক হাজারের ওপর স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে।

শীতঋতুটা ফা-হিয়েন এখানেই কাটিয়ে দেন। এখানে অবস্থানকালেই তাঁর দু'জন সতীর্থ তাও-চিং ও হুই-চিং এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

৪। ২৪ পৃষ্ঠার ১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫। প্রত্যেক বুদ্ধ তাঁদেরই বলে যাঁরা নিজেরাই শুধু নির্ব্বাণলাভ করেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য কিছুই করেন নি। এইরূপ স্বার্থপর মনোভাব বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী বললেও অত্যুক্তি হয় না।—অনুবাদক।

শীতঋতুর তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত এখানে কাটিয়ে ফা-হিয়েন ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। পথে তাঁরা তুষারাবৃত এক পর্ব্বতমালার সম্মুখীন হন। পর্ব্বতমালা অতিক্রমকালে তাঁরা হঠাৎ হিমশীতল ঝড়ের মুখে পড়ে যান এবং তাঁদের বাক্‌শক্তি কিছুক্ষণের জন্য প্রায় সম্পূর্ণরূপেই হারিয়ে ফেলেন। ফা-হিয়েনের সতীর্থ হুই-চিং বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর চলৎশক্তি রহিত হয়ে যায়। তাঁর মুখ দিয়ে কেবল সাদা গেঁজলা উঠতে থাকে। হুই-চিং বুঝেছিলেন যে, তিনি জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছেন, তাই তিনি ফা-হিয়েনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না, আপনারা যত শীঘ্র পারেন এখান থেকে চলে যান, যেন আমরা একসঙ্গে সবাই মিলে এখানে মরে না যাই।" এর কিছুক্ষণ পরেই তাঁর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়। ফা-হিয়েন তাঁর সতীর্থের এই অকালমৃত্যুতে বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কেঁদে ফেলেন। তিনি তাঁর সতীর্থের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমাদের মূল উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে গেল—নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, আমরা এখন কি করি?" যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে সর্ব্বশেষ সতীর্থ তাও-চিংসহ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করে রোহি৬ নগরে এসে পৌঁছেন। এখানে ফা-হিয়েন প্রায় তিন হাজার ভিক্ষুকে বসবাস করতে দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে মহাযান ও হীনযান এই উভয়পন্থী ভিক্ষুই আছেন, এখানে এঁরা 'বর্ষাবসানকাল' কাটিয়ে পো-নতে (বর্ত্তমান বান্নু) এসে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে পুনরায় সিন্ধুনদ পার হয়ে ভিদায় (বর্ত্তমান পঞ্জাবের অন্তর্গত) এসে পৌঁছেন। এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের খুবই প্রসারলাভ ঘটেছে এবং উভয়পন্থী ভিক্ষুরই বাস রয়েছে। এখানকার ভিক্ষুরা ফা-হিয়েন ও তাঁর সতীর্থকে দেখে খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যান এই

৬। রোহি আফগানিস্থানের একটি নাম, কিন্তু ফা-হিয়েন এর একটি অংশ বিশেষকেই এখানে উল্লেখ করেছেন মাত্র—(Travels of Fa-hien, p. 41)।

ভেবে যে, কত দূরদেশ থেকে ধর্ম্মানুশাসনের সন্ধানে এঁদের আসতে হয়েছে। তাঁরা অবশ্য খুবই সহানুভূতির সঙ্গে তীর্থযাত্রিদ্বয়কে আদর-আপ্যায়ন করেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সাহায্য করেন। এখান থেকে ক্রমাগত দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হয়ে তীর্থযাত্রীরা মথুরায় এসে পৌঁছেন। পথিমধ্যে অসংখ্য বিহার ও শতসহস্র ভিক্ষুর সংস্পর্শে এসে এঁরা তৃপ্ত হন।

দশম পরিচ্ছেদ

মথুরায় পৌঁছানোর পর তীর্থযাত্রীরা যমুনা নদীর তীর ধরে এগোতে থাকেন। নদীর দুই তীরে অনেকগুলি বিহার নির্মিত হয়েছে এবং সেখানে অনেক ভিক্ষু বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন। ধর্মানুশাসনগুলি যেমন এখানে বহুল-প্রচারিত তেমনি এখানকার অধিবাসীরা অনুশাসনগুলি মেনে চলতেও উদ্‌গ্রীব। মরুভূমির সীমান্ত থেকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত সবকটি রাজ্যের রাজারাই বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও সেগুলি তাঁরা মেনে চলতে চেষ্টাশীল। যখন রাজারা কোন ভিক্ষুসম্প্রদায়কে কিছু দান করে থাকেন তখন তাঁরা তাঁদের রাজমুকুট খুলে রেখে রাজ-পরিবারবর্গ ও পরিষদবর্গের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেরাই ভিক্ষুদের খাদ্যাদি পরিবেশন করেন। এর পর রাজা ভূমিতে একটি কার্পেট বিছিয়ে ভিক্ষুপ্রধানের সামনা-সামনি হয়ে ভূমিতেই আসন গ্রহণ করেন। এঁদের (ভিক্ষুদের) সামনে সিংহাসনে বসবার তাঁর সাহস হয় না। ভগবান বুদ্ধ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন তাঁকে রাজারা যে প্রথায় তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন আজও সেই প্রথাতেই তাঁরা ভিক্ষুদের শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন, এর কোনরূপ অদলবদল হয় নি।

এখান থেকে সুরু করে দক্ষিণ দিকের সমগ্র অঞ্চলটাকেই 'মধ্যরাজ্য' বলা হয়। এই অঞ্চলের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। অন্যান্য স্থানের মত এখানে তুষারপাত হয় না বা 'লু' বয় না। এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের সম্পদে তৃপ্ত ও সুখী। রাজাকে এদের কোন করও দিতে হয় না বা এদের সম্পত্তির কোন হিসাবও দিতে হয় না। যারা রাজার জমি চাষ করেন তাদেরই কেবলমাত্র জমি থেকে উদ্ভূত লাভের একটা অংশ রাজ-তহবিলে জমা দিতে হয়। এদেশের অধিবাসীরা যখন খুশী ও যেখানে খুশী চলে যেতে পারেন

বা এসে বাস করতে পারেন। মৃত্যুদণ্ড-প্রথা ব্যতিরেকেই এদেশের রাজা তাঁর রাজ্যশাসন করেন। অপরাধের তারতম্য অনুসারে অপরাধীকে লঘু ও গুরু দণ্ড দেওয়া হয়, এমন কি রাজবিদ্রোহীদেরও কেবলমাত্র ডান হাত কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাজার দেহরক্ষী ও পরিষদবর্গকে মাসিক মাহিনার কড়ারে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। একমাত্র চণ্ডাল বাদে কেউই প্রাণীহত্যা করে না, মদ্যপান করে না বা পিঁয়াজ-রশুন খায় না। যারা দুষ্টপ্রকৃতির লোক তাদেরকেই 'চণ্ডাল' নামে অভিহিত করা হয়। এরা অবশ্য সমাজ থেকে আলাদাভাবেই বাস করে এবং এরা যখন কোন বাজারে বা নগরে ঢোকে তখন একটি লাঠি ঠুকে চলে, যাতে করে অন্যান্য লোকেরা তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবার সুযোগ পায়। এদেশের কেউই মুরগী বা শূয়ার পোষে না বা কোন জীবিত গবাদি পশু বিক্রয় করে না। এদেশের বাজারে কোন মদের দোকান বা মাংস বিক্রয়ের দোকান নেই। জিনিষপত্র কেনাকাটা হয় কড়ির মাধ্যমেই। একমাত্র চণ্ডালেরাই মৎস্যজীবী বা শিকারী হয় এবং পশু-মাংস বিক্রয় করে থাকে।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণলাভের পর এদেশের রাজারা ও বৈশ্যসম্প্রদায়ের প্রধানেরা ভিক্ষুদের জন্য বহু বিহার নির্ম্মাণ করে দিয়েছেন বা তাঁদের ভরণপোষণের জন্য ধানজমি, গবাদি পশু, ঘরবাড়ী, ফলের বাগান প্রভৃতি দান করে গিয়েছেন। তাঁদের এই দানের কথা প্রস্তর-ফলকে খোদিত করে রাখা হয়েছে যাতে করে তাঁদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা এবিষয়ে অবগত হতে পারেন এবং এতে হস্তক্ষেপ না করেন। এখনও পর্য্যন্ত সেই সব ব্যবস্থাই বলবৎ আছে।

এদেশের ভিক্ষুদের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে পুণ্যকার্য্যাদি সম্পাদন করা, ধর্ম্মসূত্র পাঠ করা এবং সাধন-সমাধিতে মগ্ন থাকা। যখন কোন বিহারে কোন বিদেশী ভিক্ষুর আগমন হয় তখন বিহারের পুরাতন বাসিন্দারা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। আগন্তুক ভিক্ষুর বস্ত্রাদি ও

ভিক্ষাপাত্র তাঁরা নিজেরাই বহন করে নিয়ে যান এবং আগন্তুককে পদ প্রক্ষালনের জন্য জল দেন। তাঁকে (আগন্তুক ভিক্ষুকে) বিহারের সাধারণ খাদ্য গ্রহণের সময়ে জলীয় খাদ্যাদি পরিবেশন করা হয়। এর পর আগন্তুক কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করলে পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি কত দিন ধরে এই ভিক্ষুজীবন যাপন করছেন। সেটি জানান হলে পর বিহারের নিয়ম অনুসারে মর্য্যাদাসম্পন্ন ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

সাধারণতঃ ভিক্ষুসম্প্রদায় যেখানে বসবাস করেন সেইখানে তাঁরা বুদ্ধের তিন প্রিয়শিষ্য শারিপুত্র[১] মৌদ্গল্যায়ন[২] ও আনন্দের উদ্দেশ্যে একটি করে স্তূপ রচনা করে থাকেন। ত্রিপিটক (বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র) বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ

১। শারিপুত্র (সিং ? শেরিউৎ ?)—বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য এবং সম্ভবতঃ তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে বিদ্যায়, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ—যার জন্য তাঁকে জ্ঞানীর সম্মান দেওয়া হয়েছিল। তিনি বুদ্ধের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। এঁর মাতা শারিকা নালন্দার অধিবাসী ছিলেন এবং বোধ হয় তাঁর নাম থেকেই ছেলের নামকরণ শারিপুত্র হয়। অনেকে এঁকে উপতিষ্য নামেও অভিহিত করেন। ঐ নাম এঁর পিতা তিষ্যের নামানুসারেই রাখা হয়েছিল। অভি-ধর্ম্মের ভক্তরা এঁকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখেন। কারণ ইনিই তাঁদের গুরু। ইনি শাক্যমুনির পূর্ব্বেই মারা যান। ইনিও পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধ হয়ে পুনরায় ধরাধামে আবির্ভূত হবেন বলেই বৌদ্ধদের বিশ্বাস।

২। মৌদ্গল্যায়ন—এটি একটি সিংহলী নাম। ইনি বুদ্ধের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং ইনি বুদ্ধের বামহস্তস্বরূপ ছিলেন। এঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির ও সম্মোহন শক্তির জন্য ইনি বিখ্যাত। ইনি 'তুষিত' স্বর্গে শাক্যমুনির আকৃতির একটা আঁচ পাবার জন্য একজন শিল্পীকে 'তুষিত' স্বর্গে নিজের বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা নিয়ে গিয়েছিলেন। ইনি নিজের মাতাকে নরক থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ইনিও শাক্যমুনির পূর্ব্বেই মারা যান। বৌদ্ধদের বিশ্বাস ইনিও ভবিষ্যৎকালে পুনরায় মর্ত্যধামে বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হবেন।

অভিধর্ম্ম, বিনয় ও স্থত্রের সম্মানার্থেও অনেক স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ 'বর্ষাবসানকালের' এক মাস পরে প্রত্যেকটি ধার্ম্মিক পরিবার একত্রে মিলিত হয়ে ভিক্ষুদের দান করার উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে ভিক্ষুদের মধ্যে প্রয়োজনাহুসারে তা বণ্টন করে দেন। ভিক্ষুরাও একটি বিরাট সভা ডেকে সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শোনান। সভা-শেষে ভিক্ষুরা শারিপুত্রের স্তূপেতে ফুল ও ধূপাদি অর্ঘ্য দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সারারাত্রি ধরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন। অভিনেতা ও সঙ্গীতজ্ঞদের নিযুক্ত করে একটি পালা অভিনয়েরও আয়োজন তাঁরা করে থাকেন। এটা বলাই বাহুল্য যে, পালাটি শারিপুত্রের জীবনকে ঘিরেই অর্থাৎ তাঁর বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ, সংসারধর্ম্ম ত্যাগ, ভিক্ষুজীবন গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই রচিত। মৌদ্গল্যায়ন ও আনন্দের জীবনকে নিয়েও অনুরূপ পালাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। ভিক্ষুণীরা সাধারণতঃ আনন্দের স্তূপেই তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে থাকেন। কারণ, আনন্দই বুদ্ধদেবকে নারীদের সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণীজীবনযাপন করার অনুমতি দেবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্রমণীরা সাধারণতঃ রাহুলের[৩] উদ্দেশ্যেই তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে থাকেন। এটা একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অনুষ্ঠানের জন্য এক-একটি দিন ধার্য্য করা হয়। মহাযানপন্থীরা প্রজ্ঞাপারমিতা[৪]

৩। শাক্যমুনির জ্যেষ্ঠপুত্র রাহুল যশোধরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পর ইনিও পিতার সঙ্গী হন এবং পিতার মৃত্যুর পর 'বৈভাষিক' পন্থের প্রচলন করেন। ইনি নবাগত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের গুরু বলে খ্যাত। ইনি পুনরায় ভবিষ্যৎ-বুদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপেই জন্মগ্রহণ করবেন। (Travels of Fa-hien)।

৪। প্রজ্ঞাপারমিতা—পারমিতা দেবীদের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা শীর্ষ-স্থানীয়া। প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে তাঁর রূপকল্পনা

মঞ্জুশ্রী৫ ও অবলোকিতেশ্বরের৬ উদ্দেশ্যে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে পর ভিক্ষুরা তাঁদের বাৎসরিক খাদ্যশস্যাদির দান গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য-প্রধান কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেদের প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ করে থাকেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের সময় থেকেই পবিত্র সম্প্রদায়বিশেষে যে সব নিয়মাবলীর বা অনুষ্ঠানাদির

করা হয়েছে। মহাযানে দশটি পারমিতার রূপ রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে—রত্ন, দান, শীল, বীর্য্য, ধ্যান, উপায়, বল, জ্ঞান ও বজ্রকর্ম্ম—(বৌদ্ধদের দেব-দেবী—শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা—১২০-১০৪)।

৫। বৌদ্ধদেবসঙ্ঘে মঞ্জুশ্রীর স্থান অতি উচ্চে। যত বোধিসত্ত্ব আছেন তাঁর মধ্যে মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরই সর্ব্বপ্রধান। মঞ্জুশ্রীর পূজা-পদ্ধতি সকল বৌদ্ধ দেশেই বিদ্যমান। মঞ্জুশ্রী পরাবিদ্যা ও পরাজ্ঞানের দেবতা। তাঁর মূল প্রহরণ দক্ষিণ করে উদ্যত অসি ও বাম করে হৃৎপ্রদেশে রক্ষিত প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক। অসি দ্বারা তিনি সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা ও অজ্ঞতা ছেদন করেন এবং পুস্তক দ্বারা পরাপ্রজ্ঞা বা পূর্ণশূন্যের জ্ঞান জগতে প্রচার করেন। এঁর বিভিন্নরূপে পূজিত রূপগুলি হচ্ছে বাক বা বজ্ররাগ মঞ্জুশ্রী, ধর্ম্মধাতু বাগীশ্বর, মঞ্জুঘোষ, সিদ্ধৈকবীর, বজ্রানঙ্গ, নামসঙ্গীতি মঞ্জুশ্রী, বাগীশ্বর, মঞ্জুবর, মঞ্জুবজ্র, মঞ্জুকুমার, অরপচন, স্থিরচক্র ও বাদিরাট্।

৬। মঞ্জুশ্রীর মত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের স্থান বৌদ্ধদেবসঙ্ঘে অতি উচ্চে। যে কল্প এখন চলছে সেই ভদ্রকল্পের ইনিই হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। ইনিই এখন সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা। শাক্যসিংহের পরিনির্ব্বাণের পর থেকে যতদিন না ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয় আসেন ততদিন সৃষ্টিরক্ষার জন্য ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য, উপদেশ ইত্যাদি অবলোকিতেশ্বরই করবেন। অবলোকিতেশ্বর করুণার অবতার। ইনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যতদিন পৃথিবীতে একটি প্রাণীও দুঃখে অভিভূত থাকবে ততদিন তিনি নির্ব্বাণলাভ করবেন না। (বৌদ্ধদের দেবদেবী—শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা ৩৪-৫৯)

প্রচলন হয়েছিল তা আজও পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে। এর কোন অন্যথা হয় নি।

তীর্থযাত্রিদ্বয় মথুরা থেকে আঠার যোজন দূরবর্ত্তী সাংকাস্যসেৎ-এ ৭ এসে পৌঁছেন। ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গে৮ তাঁর মাতাকে তিন মাস ধরে ধর্ম্মকথা পাঠ করে শোনানোর পর বুদ্ধদেব এইখানেই নেমে এসে প্রথম পৃথিবী স্পর্শ করেন। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যবর্গের অজ্ঞাতে স্বীয় ঐশ্বরিক শক্তিবলে ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গে যান এবং তিন মাস কাল পূর্ণ হবার সাত দিন আগে তিনি তাঁর অদৃশ্যরূপ পরিগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ৯ তাঁর ঐশ্বরিক দৃষ্টি দিয়ে বুদ্ধদেবকে দেখতে পান ও মৌদ্গল্যায়নকে বুদ্ধদেবের পাদপূজা করার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর পাদপূজা করেন। এর পর বুদ্ধদেব মৌদ্গল্যায়নকে জানান যে আর সাত দিন বাদেই তিনি জম্বুদ্বীপে অবতরণ করবেন।

বহুদিন ধরে বুদ্ধদেবকে দেখতে না পেয়ে যখন সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আকাশের দিকে বুদ্ধদেবকে দেখতে পাবেন বলে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তখন উৎপলা নামে এক ভিক্ষুণী বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

৭। কনৌজের ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত এই সাংকাস্যসেৎ গ্রাম।

৮। দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গকেই 'ত্রয়ত্রিংশ' স্বর্গ বলা হয়। মেরু পর্ব্বতের চারি চূড়ার মধ্যে এই স্বর্গের অবস্থিতি। এখানে দেবতাদের বত্রিশটি নগর আছে যার আটটি মেরু-পর্ব্বতের চূড়ায় উপর অবস্থিত। ইন্দ্রের রাজধানী বেলীভূ এরই মধ্যস্থানে অবস্থিত। এখানে তিনি সহস্র মস্তক ও সহস্র চক্ষু নিয়ে সিংহাসনে বসে আছেন এবং তাঁর রাজত্ব পরিচালনা করছেন।

(Travels of Fa-hien by Legge, p. 48)

৯। অনিরুদ্ধ শাক্যমুনির কাকা অমৃতদানের পুত্র! বুদ্ধের জীবনের শেষভাগে এঁর উল্লেখ বহুস্থানে পাওয়া যায়। এঁর দিব্যচক্ষুর জন্য ইনি বিখ্যাত (Travels of Fa-hien by Legge, p. 48)।

জানান যে, তুষিতস্বর্গ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করার পর তিনিই যেন বুদ্ধদেবকে প্রথম শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। বুদ্ধদেব তাঁর সে প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন।

বহুদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। নীল আকাশের বুক চিরে দেখা দিল তিনধাপবিশিষ্ট একটি মণিমাণিক্যখচিত সিঁড়ি, যার মধ্যধাপে ভগবান বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ডান এবং বাঁ দিকে আরও দুটি সিঁড়ি দেখা গেল। ডান দিকের সিঁড়িটা রূপার তৈরী ও বাঁদিকের সিড়িটা সোনার তৈরী। ডান দিকের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভগবান ব্রহ্মা তাঁর শ্বেতবর্ণের চামরটি নিয়ে বুদ্ধদেবকে ব্যজন করছেন ও বাঁদিকের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধদেবের মাথার ওপর একটি মণিখচিত ছত্র খুলে ধরে রয়েছেন। অসংখ্য দেবতাও বুদ্ধদেবের সঙ্গী হয়েছেন। বুদ্ধদেব মাটির পৃথিবী স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি সিঁড়িই পৃথিবীর বুকে মিলিয়ে গেল। মাত্র একটা ধাপ দৃশ্যমান হয়ে রইল। ভবিষ্যৎ কালে এই ধাপের শেষ প্রান্তের সন্ধান পাবার জন্য রাজা অশোক এই স্থানের মাটি খুঁড়িয়েছিলেন কিন্তু অনেক দূর পর্য্যন্ত খুঁড়েও যখন এর শেষ বার করতে পারলেন না তখন তিনি এখানকার স্থানমাহাত্ম্য স্বীকার করে নিয়ে এখানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করে দেন এবং ধাপের ওপর একটি ১৬ ফুট দণ্ডায়মান বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারের পিছন দিকে তিনি একটি ৫০ ফুট উঁচু প্রস্তর স্তম্ভও নির্ম্মাণ করেন। স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি সিংহের মূর্ত্তি[১০] স্থাপন করা হয়েছিল। স্তম্ভগাত্রের চারিপাশে চারিটি কাঁচের মতন স্বচ্ছ বুদ্ধের মূর্ত্তিও খোদিত করে দেওয়া হয়েছিল। কথিত আছে এক সময় অন্যধর্ম্মাশ্রিত যাজকেরা এখানকার অধিবাসী ভিক্ষুদের এখানে বাস করার অধিকারের

১০। ফা-হিয়েন তাঁর বিবরণীতে এখানকার স্তম্ভের শীর্ষদেশে সিংহমূর্ত্তি আছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসলে সেটি একটি হস্তীমূর্ত্তি। হিউ-এন-সাঙ তাঁর বিবরণীতে হস্তীর উল্লেখই করেছেন। (পৃ. ৫২)

প্রশ্ন তোলেন। তর্কে ভিক্ষুরা হেরে গিয়ে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাঁদের আকুল প্রার্থনা জানান যে, যদি এই-ই তাঁর অভিপ্রেত হয় তা হলে তাঁরা যাবেন কোথায়? একটা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে এর মীমাংসা হোক এইটাই তাঁরা চান। তাঁদের প্রার্থনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শীর্ষ দেশের সিংহমূর্ত্তিটি একটা বিরাট গর্জ্জন করে উঠে এ স্থানের মাহাত্ম্য প্রমাণিত করল। এই ঘটনার পর অবশ্য যাজকেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যান। বুদ্ধদেব পৃথিবীতে অবতরণ করার পর প্রথম পূজা গ্রহণ করেন ভিক্ষুণী উৎপলার১১ কাছ থেকে। বুদ্ধদেবের পাদস্পর্শে ধন্য প্রতিটি স্থানেই ভবিষ্যৎ কালে স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে।

এই দেশ সত্যই খুব উর্ব্বর এবং ধনধান্যে পূর্ণ। এ রকম সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সম্পদশালিনী ভূমি দেখতে পাওয়া খুবই দুষ্কর। এমন একটা দেশ দেখা যায় না যার সঙ্গে এর তুলনা চলে। এ দেশের লোকেরা অতিথিপরায়ণ এবং বিদেশীদের খুবই আদর আপ্যায়ন করেন এবং সর্ব্বদিক দিয়ে তাঁদের সাহায্য করেন যাতে তাঁদের কোনরূপ কষ্ট না হয়।

তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে যাত্রা করে ৫০ যোজন দূরবর্ত্তী অগ্নিদগ্ধ নামক একটি বিহারে এসে পৌঁছেন। অগ্নিদগ্ধ প্রথম জীবনে একটি দৈত্য ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে বুদ্ধদেব এঁকে তাঁর ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। দীক্ষা গ্রহণের পর এখানকার অধিবাসীরা একটি বিহার নির্ম্মাণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে বিহারটিকে উৎসর্গ করেন। কথিত আছে যে, এই 'অর্হৎ' (অগ্নিদগ্ধ) একবার বুদ্ধদেবের হাতে জলপ্রদান করেন এবং প্রদানকালে বুদ্ধের হাত থেকে কয়েক ফোঁটা জল মাটিতে পড়ে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই সামান্য জলের দাগ শত চেষ্টা করেও মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। এখানে একটি স্তূপ আছে

(১১) ইনি সম্পর্কে শাক্যমুনির খুড়ী ছিলেন এবং শাক্যমুনিকে ইনি সেবাশুশ্রূষা করতেন। বৌদ্ধধর্ম্মে ইনিই প্রথম নারী যাঁকে ভিক্ষুণীর জীবনযাপন করবার প্রথম অনুমতি দেওয়া হয়েছিল (Travels of Fa-hien, p. 52)।

সেটি বুদ্ধের উদ্দেশ্যেই স্থাপিত। স্তূপটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব একটি ব্রহ্মদৈত্যের প্রতি অর্পিত হয়েছিল। একদা এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাজা পরীক্ষা করবার জন্যে তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে স্তূপের চারধার ঘিরে বিরাট একটা আবর্জ্জনা-স্তূপের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মদৈত্যটি তার নিজের ক্ষমতাবলে এমন একটি ঝড়ের সৃষ্টি করে যে, সেই আবর্জ্জনা-সমূহ উড়ে যে কোথায় চলে যায় কেউ তা বলতে পারে না এবং এই অঞ্চলের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা পূর্ব্বের মতই বজায় থাকে।

এই বিহারের চারপাশে অসংখ্য স্তূপ আছে। এর মধ্যে প্রত্যেক বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভস্থানের উপর নির্ম্মিত স্তূপটাই উল্লেখযোগ্য। নির্ব্বাণ-স্থানটির পরিমাপ একটি গো-শকটের চাকার পরিমাপের চেয়ে বেশী নয়। অনেক চেষ্টা করেও সেইস্থানে ঘাস জন্মান সম্ভব হয় নি যদিও এর পার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র অঞ্চলটাই ঘাসে ঢাকা পড়ে গেছে।

এর পর তীর্থযাত্রীরা এখানে 'বর্ষাবসানকাল' কাটিয়ে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হতে হতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কান্যকুব্জ নগরে এসে পৌঁছেন। এখানে দুইটি বিহার আছে এবং সেদুটিতে হীনপন্থী ভিক্ষুরাই বাস করেন। এখান থেকে কিছু দূরে গঙ্গার উত্তর তীরে একটি স্থানে বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যবর্গের ধর্ম্মশিক্ষা দেন। এইখানেই বুদ্ধদেব প্রচার করেছিলেন যে—"জীবনের কোনই স্থায়িত্ব নেই। জীবনটা জলবুদ্বুদের মতই ক্ষণস্থায়ী।" এখানে গঙ্গানদী পার হয়ে তীর্থযাত্রীরা হরিগ্রামে এসে পৌঁছেন। এই হরিগ্রামেও বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন। তিনি যেখানে বসেছিলেন বা বেড়িয়েছিলেন তার প্রত্যেক স্থানেই ভবিষ্যৎ কালে একটি করে স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে সাচী[১২] নগরে এসে পৌঁছেন। হরিগ্রাম থেকে সাচীর দূরত্ব মাত্র তিন যোজন। নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়ে এগিয়ে গেলে

১২। বিখ্যাত সাচী স্তূপের সঙ্গে এই সাচী নগরীর কোন সম্পর্ক নেই। —অনুবাদক।

পথিপার্শ্বে একটি নিমগাছ দেখতে পাওয়া যায়, যার ডাল দিয়েই বুদ্ধদেব দাঁত মেজেছিলেন। গাছটি মাত্র ৭ ফুট উঁচু। এখানকার অধিবাসী ব্রাহ্মণেরা শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে যতবার এই গাছটা কেটে দিয়েছেন ততবারই নূতন করে গাছটিকে গজাতে দেখা গেছে অর্থাৎ এর বিনাশ কোনদিন হয় নি বা হবে না। এই সাচীতেই চারি বুদ্ধ১৩ এসে বসেছেন এবং বেড়িয়েছেন।

১৩। চারিবুদ্ধ হচ্ছেন কশ্যপ, ক্রকচ্ছন্দ, কনকমুনি ও শাক্যসিংহ বা গৌতম। এ ছাড়াও আর তিনটি মানস বুদ্ধের উল্লেখ আছে। তাঁরা হচ্ছেন বিপশ্যী, শিখী ও বিশ্বভু।

(বৌদ্ধদের দেবদেবী—শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা-৪৪)

একাদশ পরিচ্ছেদ

এর পর তীর্থযাত্রীরা আট যোজন পথ অতিক্রম করে কোশল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত শ্রাবস্তী নগরে এসে পৌঁছেন। শ্রাবস্তীতে তীর্থযাত্রীরা মাত্র ২০০ ঘর পরিবারের বসতি দেখেছিলেন। পুরাকালে রাজা প্রসেনজিৎ[১] এখান থেকেই তাঁর রাজ্য পরিচালনা করতেন। এখানেও অনেকগুলি স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে, তার মধ্যে যেখানে মহাপ্রজাপতির বিহার ছিল সেখানে সুদত্ত[২] বাস করতেন। যেখানে অঙ্গুলিমাল[৩] 'অর্হত্ব' লাভ করেছিলেন এবং যেখানে তাঁকে পরিনির্ব্বাণলাভের পর দাহ করা হয়েছিল সেইস্থানের স্তূপগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা এইগুলি ধ্বংস করবার জন্য খুবই চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করতে পারেন নি।

১। প্রসেনজিৎ শাক্যমুনির প্রথম দলের শিষ্য ও প্রধান ভক্ত। বুদ্ধমূর্ত্তিসমূহের প্রচলন ধরতে গেলে ইনিই করেছিলেন।

(Travels of Fa-hien p.55)

২। সুদত্তর আসল নাম ছিল অনাথপিণ্ড। ইনি শ্রাবস্তী নগরীর বৈশ্যদের প্রধান ও নগরীর একজন সম্ভ্রমশালী লোক ছিলেন। ফা-হিয়েন তাঁর পুরাতন বাড়ীর দেওয়াল ও কুয়োটাই মাত্র ভারত পরিভ্রমণকালে দেখতে পেয়েছিলেন (Travels of Fa-hien, p. 59)।

৩। অঙ্গুলিমাল এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত শৈব যাঁরা আত্মবিসর্জ্জন করাকে ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান হিসাবে গণ্য করেন। বুদ্ধদেব এঁকে দীক্ষা দিলে পর ইনি ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন। শেষ পর্য্যন্ত ইনি 'অর্হৎ' পর্য্যায়ভুক্ত হন।

(Travels of Fa-hien, p. 56)

নগরের দক্ষিণ দিকে সুদত্ত একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন যার নামকরণ করা হয়েছিল জেতবন বিহার৪। এই জেতবন বিহারের চারদিকের দ্বার যখন খুলে দেওয়া হয় তখন চারটি প্রস্তর স্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটির শীর্ষদেশে একটি করে চক্র ও একটি করে ষাঁড়ের মূর্ত্তি খোদিত করা আছে—চক্রটি বামদিকে ও ষাঁড়টি দক্ষিণদিকে। বিহারের বামদিকে ও দক্ষিণদিকে দুটি পুষ্করিণীও খনন করা হয়েছিল। দুটি পুষ্করিণীরই জল অতি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। বিহারের চতুর্দ্দিকেই বিভিন্ন ধরণের সুগন্ধি ফুলের গাছ রোপণ করা হয়েছে। সেইজন্য এই বিহারের সমগ্র রূপটি শুধুমাত্র সৌন্দর্য্যমণ্ডিতই নয়—এক অতুলনীয় সুন্দরের সাধনক্ষেত্রও বলা চলে।

বুদ্ধদেব যখন 'ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে' তাঁর মাতাকে ৯০ দিন ধরে ধর্ম্মবাণী পাঠ করে শোনাতে গিয়েছিলেন তখন রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধের অদর্শনে বিমর্ষ হয়ে একটি 'গোশীর্ষ' চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়ে ভগবান বুদ্ধ যেখানে সাধারণতঃ বসতেন সেইখানে স্থাপন করেন ; পরে বুদ্ধদেব যখন এই বিহারে পুনঃপ্রবেশ করেন তখন এই কাষ্ঠ মূর্ত্তিটি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে আপনা থেকেই এগিয়ে আসে কিন্তু বুদ্ধদেব মূর্ত্তিটিকে তার স্বস্থানে ফিরে যেতে নির্দ্দেশ দেন এবং বলেন, "আমার পরিনির্ব্বাণলাভের পর তুমিই আমার চারিশ্রেণী শিষ্যবর্গের আধারস্বরূপ হয়ে থাকবে।" এই কথা শোনার পর মূর্ত্তিটি পুনরায় স্বস্থানে ফিরে যায়। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে এইটাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধমূর্ত্তি যা দেখেই পরবর্ত্তীকালের অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছিল।

কথিত আছে জেতবন বিহারটি প্রথমে সাততলা উঁচু ছিল। বিভিন্ন দেশের রাজারা বিভিন্ন রঙের মণিখচিত সামিয়ানা দিয়ে বিহারের উপরটা

৪। শ্রাবস্তীর একটি বিখ্যাত বিহার। প্রসেনজিৎ পুত্র যুবরাজ জেতার কাছ থেকে অনাথপিণ্ড বুদ্ধের বাসস্থানের নিমিত্ত এটি কিনেছিলেন। এখানে বুদ্ধদেব বহুকাল ধরে বাস করেছিলেন। (Travels of Fa-hien, p. 57)

মুড়ে দিতেন, ফুল ছড়াতেন ও ধূপাদি জ্বালতেন। দিনের আলোর মতন রাতটাকেও উজ্জ্বল করে রাখার জন্য অসংখ্য প্রদীপও জ্বালিয়ে রাখা হ'ত। এখানে পূর্ব্বে প্রায়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পরিচালিত হ'ত। এইরূপ একটি উৎসব অনুষ্ঠানকালে একটি ইঁদুর একটি জ্বলন্ত প্রদীপের সলতে মুখে করে নিয়ে ওপরে উঠে যায় এবং সেই সলতের আগুন থেকেই কিরকমভাবে সামিয়ানায় আগুন ধরে যায় যার ফলে সারা বিহারটাই অগ্নিদগ্ধ হয়। অবশ্য বুদ্ধদেবের কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তিটি অক্ষত থাকে। এর পর বিহারটিকে নূতন করে নির্ম্মাণ করা হয় এবং সেটি মাত্র দ্বিতল করা হয়। এইটাই ফা-হিয়েন দেখেছেন।

ফা-হিয়েন ও তাঁর সতীর্থ যখন এই জেতবনের সবকিছু দেখে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁরা মনে মনে খুবই দুঃখিত হন এই ভেবে যে, ভগবান বুদ্ধ এই জেতবন বিহারে প্রায় ২৫ বৎসরকাল বাস করেছিলেন কিন্তু এই সব পুণ্যক্ষেত্র দর্শনলাভ করতে তাঁদের কত দূর দেশ থেকেই না আসতে হয়েছে। যখন ইচ্ছা তখনই এসব দেখার সৌভাগ্য তাঁদের নেই। তাঁদের সঙ্গীদের মধ্যে যাঁরা পথিমৃত্যু বরণ করেছেন বা যাঁরা মাঝপথ থেকেই ফিরে গেছেন তাঁরা ত দেখতেই পেলেন না ভগবান বুদ্ধের এই লীলাক্ষেত্র। ফা-হিয়েন ও তাঁর সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে এখানকার ভিক্ষুরা যখন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন যে, এঁরা সুদূর চীন থেকে এসেছেন তখন তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন যে, এ পর্য্যন্ত তাঁরা কোন চীনদেশীয় ভিক্ষুকে আসতে দেখেন নি বা এসেছেন বলে শোনেন নি।

এই বিহারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটা বাঁশবন আছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'দৃষ্টিদান'। কথিত আছে, পূর্ব্বে এখানে প্রায় ৫০০ জন অন্ধ লোকের বাস ছিল। বুদ্ধদেব তাঁদের মধ্যে তাঁর ধর্ম্মবাণী প্রচার করার পর তাঁরা দৃষ্টি ফিরে পান। আনন্দে অধীর হয়ে বুদ্ধের এই ৫০০ নূতন শিষ্য তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে বুদ্ধের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানান এবং ভূমিতে তাঁদের

যষ্টি পুঁতে ফেলেন। এই যষ্টি থেকেই নাকি পরবর্ত্তীকালে বাঁশবনের স্বষ্টি হয়। এখনও জেতবনের ভিক্ষুরা মধ্যাহ্ন আহার্য গ্রহণের পর এই বনেতেই সমাধিতে বসেন।

কিছু দূরে আর একটি বিহার দেখতে পাওয়া যায়। বিহারটির নাম মাতা বৈশাখা। একদা বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যবর্গের জন্য এ'টি নির্মিত হয়েছিল। এখানে ভিক্ষুদের জন্য নির্ম্মিত অনেকগুলি বাড়ীও দেখতে পাওয়া যায়; প্রত্যেকটি বাড়ীরই দুটো করে দরজা—একটা উত্তরে, অপরটি দক্ষিণে।

বৈশ্যপ্রধান সুদত্ত এই বনটিতে স্বর্ণমুদ্রা বিছিয়ে দিতে যতগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রয়োজন—ততগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে এই বনটি ক্রয় করেন ও বুদ্ধদেবের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করে দেন। বুদ্ধদেব মরজগতে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী সময় কাটিয়েছেন এই জেতবন-বিহারেই। বনের মধ্যস্থানে একটি স্থান চিহ্নিত করা আছে—যেখানে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় সুন্দরী নাম্নী একটি বেশ্যা একটি লোককে খুন করে খুনের দায় মিথ্যা করে বুদ্ধের উপর চাপিয়ে দেয়।৫

জেতবনের পূর্ব্বদ্বারের বাইরে ৭০ হাত দূরে একটি স্থান চিহ্নিত করা আছে যেখানে বুদ্ধদেব বিভিন্ন দেশের রাজা, রাজকর্ম্মচারীসমূহ ও সাধারণ জনসাধারণের মিলিত একটি সভায় ৯৬টি বিভিন্ন ধর্ম্মের ভুলগুলি বোঝাতে চেষ্টা করেন। এই সময় কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মানুরাগী লোকেদের প্ররোচনায় চণ্ডমালা নাম্নী এক নারী নিজের উদরের উপর মোটা কাপড় জড়িয়ে উদরটিকে বড় করে সর্ব্বসাধারণের কাছে মিথ্যা করে ঘোষণা করে যে, তার এই গর্ভাবস্থার জন্য বুদ্ধই দায়ী। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা

৫। Li Yung Hsi কিন্তু তাঁর Record of Buddhist kingdom-এ বলেছেন যে—বৌদ্ধধর্ম্মের একদল শত্রু সুন্দরী নাম্নী একটি বেশ্যাকে খুন করে মৃতদেহ জেতবনের মধ্যে পুঁতে রেখে ঘোষণা করে যে, বুদ্ধ তার সঙ্গে এক অবৈধ সংস্পর্শের পাপ ঢাকতে গিয়ে একে হত্যা করেছেন।

ভগবান বুদ্ধের এই অপ্রীতিকর অবস্থা দেখে সাদা ইঁদুরের রূপ ধরে চণ্ডমালার পেট-কোমরে বাঁধা কাপড়গুলির বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করে দেন। ফলে সভামধ্যেই তার পেটবাঁধা অতিরিক্ত কাপড়সমূহ খুলে মাটিতে পড়ে যায় এবং সেখানকার ধরিত্রী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে চণ্ডমালাকে জীবন্ত গ্রাস করে। এখানে আরও একটি স্থান চিহ্নিত করা আছে যেখানে দেবদত্ত তার নখে বিষ মাখিয়ে বুদ্ধদেবকে হত্যা করতে উদ্যত হওয়ায় পাতালে জীবন্ত সমাধিলাভ করে। পরবর্ত্তীকালে এর প্রত্যেকটি স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে। বুদ্ধদেব যেখানে সভা করেছিলেন পরে ঠিক সেই স্থানেই একটি বিহার নির্ম্মিত হয় এবং বিহারে বুদ্ধের বসা অবস্থায় একটি মূর্ত্তিও স্থাপন করা হয়। এই বিহারের ঠিক পূর্ব্বদিকে হিন্দুদের একটি দেবালয় আছে। তার নাম হচ্ছে "চন্দ্রচূড়"। দেবালয়টি প্রায় ৬০ ফুট উঁচু। দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের পূজা-অর্চ্চনা করার নিমিত্ত একজন পূজারী নিযুক্ত আছেন, যিনি পূজাপাঠ ও সন্ধ্যারতি করে থাকেন এবং দেবালয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। প্রভাতকালে যখন পূর্ব্বগগনে সূর্য্য উদিত হ'ন তখন বৌদ্ধবিহারের ছায়াটিতে দেবালয়টি সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে যায়, কিন্তু সূর্য্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েন তখন দেবালয়ের ছায়া বিহারের উপর না পড়ে উত্তর দিকে গিয়ে পড়ে, যা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই চোখে পড়ে। এখানকার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছেন। জেতবনের আশেপাশে প্রায় ৯৬টি বিহার নির্ম্মিত হয়েছে ও কেবলমাত্র ১টি ছাড়া সবগুলিতেই ভিক্ষুর বাস আছে।

মধ্যরাজ্যে প্রায় ৯৬টি বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে এবং এদের ধর্ম্ম প্রচারকরা প্রায় সবাই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে থাকেন কেবল বৌদ্ধভিক্ষুর সঙ্গে তাদের তফাৎ হচ্ছে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ না করা নিয়ে। বৌদ্ধভিক্ষুরাই কেবলমাত্র ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করেন। এখানকার সাধারণ লোকেরা পথিপার্শ্বে সর্ব্বসুবিধাযুক্ত পান্থশালা নির্ম্মাণ করাকে পুণ্য অর্জ্জনের

অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। পথশ্রান্ত পথিকদের বিশ্রাম ও আহারাদির সম্পূর্ণ ব্যবস্থা এইসব পান্থশালায় আছে। নগরের দক্ষিণ দিকে একটা স্তূপ আছে। স্তূপটি বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক রাজা বিরুধককে শাক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করার ঘটনাটিকে স্মরণ করেই রচিত হয়েছে।

এখান থেকে যাত্রা করে তীর্থযাত্রীরা পশ্চিমে পঞ্চাশ 'লী' অগ্রসর হয়ে তাদওয়া নগরে এসে পৌঁছলেন। এইখানেই কশ্যপ বুদ্ধ (প্রথম বুদ্ধ) জন্মেছিলেন ও পরিনির্ব্বাণ লাভ করেছিলেন।

শ্রাবস্তীতে পুনরায় ফিরে এসে তীর্থযাত্রীরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকেন ও প্রায় ১২ যোজন পথ অতিক্রম করলে পর নাপিকা নগরে এসে পৌঁছান। এখানে ক্রকুছন্দবুদ্ধ (দ্বিতীয় বুদ্ধ) জন্মেছিলেন। কনকমুনিবুদ্ধ (তৃতীয় বুদ্ধ) যেখানে জন্মেছিলেন সে স্থানটি এখান থেকে মাত্র এক যোজন দূরে অবস্থিত।

এর পর তীর্থযাত্রীরা কপিলবাস্তুর দিকে যাত্রা করেন ও মাত্র এক যোজন পথ অতিক্রম করে কপিলবাস্তুতে এসে পৌঁছান।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গৌতম বুদ্ধের জীবন-স্মৃতি বিজড়িত এই কপিলবাস্তু নগরী এক সময় বহু লোকের কোলাহলে সব সময় মুখর থাকত, কিন্তু এখন সেই কপিলবাস্তুই একেবারে মূক-বধির হয়ে গেছে, কোনরূপ প্রাণের স্পন্দন নেই বলেই মনে হয়। নগরী জনশূন্য বললেই হয়, মাত্র দুই-এক ঘর পরিবার ও কয়েকজন ভিক্ষু এই বিরাট নগরীর ধ্বংসস্তূপ আগলে পড়ে আছেন। এই নগরীতে অসংখ্য স্তূপ আছে, তার মধ্যে শুদ্ধোদন প্রাসাদে মায়াদেবীর গর্ভধারণের পূর্ব্বে শাক্যমুনির শ্বেতহস্তীর পৃষ্ঠশোভিত মূর্ত্তিটি যেখানে প্রথম দেখা গিয়েছিল, যেখানে রাজপুত্র (গৌতম) দুঃস্থ লোকদের দেখে তাঁর রথ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন, যেখানে অসিত যুবরাজের দেহের চিহ্নসমূহ প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন, বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধদেব যেখানে তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যেখানে শাক্যসম্প্রদায়ভুক্ত পাঁচ শত নরনারী সংসার ত্যাগ করে এসে উপলীকে তাদের শ্রদ্ধা জানান, যেখানে বুদ্ধদেব দেবতাদের মাঝে তাঁর ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রচার করেছিলেন ও যে ন্যগ্রোধবৃক্ষের তলে বসে বুদ্ধদেব মহাপ্রজাপতির কাছ থেকে পোষাকাদি গ্রহণ করেছিলেন সেই সব বিশিষ্ট স্থলের উপর নির্ম্মিত স্তূপসমূহই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজ-উদ্যান লুম্বিনী কপিলবাস্তুর পঞ্চাশ 'লী' পূর্ব্বদিকে। এই উদ্যানেরই পুকুরে স্নান করে রাণী মায়াদেবী যখন উদ্যানের মধ্য দিয়ে আসছিলেন সেই সময়ে তিনি গাছের ডাল ধরে পূর্ব্বমুখী হয়ে বসে পড়ে একটি সুন্দর রাজপুত্র (গৌতম) প্রসব করেন। যুবরাজ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তপদ এগিয়ে যান এবং দুই জন দৈত্যরাজা যুবরাজকে স্নান করান। স্থানটিকে ঘিরে একটি কুয়ো গেঁথে দেওয়া হয়েছিল, এখনও সেই কুয়োর জল খেয়ে ভিক্ষুরা তৃপ্ত হন। বিভিন্ন বুদ্ধের জীবনে চারিটি ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা

গেছে এবং সেটা একই স্থানে বার বার ঘটেছে দেখা যায়। ঘটনাগুলি হচ্ছে বুদ্ধত্বলাভ, ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া এবং মাতাকে ধর্ম্মবাণী পাঠ করে শুনিয়ে ধরিত্রী পৃষ্ঠে পুনঃ পদার্পণ। এ ছাড়া অন্যান্য ঘটনাগুলি বুদ্ধেরা সময়, কাল, পাত্র হিসাবে নিজেরাই নির্ব্বাচন করে নিয়েছেন দেখা গেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রীরা এর পর লুম্বিনী থেকে রামগ্রাম রাজ্যে এসে পৌঁছলেন। এই দেশের রাজা বুদ্ধের পূতাস্থির কিয়দংশ সংগ্রহ করে এই রামগ্রামেই এনে রাখেন, একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন ও স্তূপের নামকরণ করেন রামগ্রাম। এই স্তূপের পার্শ্বেই একটি পুকুর আছে। কথিত আছে, এই পুকুরে পূর্ব্বে একটি নাগদৈত্য বাস করতেন এবং এই স্তূপটি দিবারাত্র রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। যখন রাজা অশোক বুদ্ধদেবের পূতাস্থির উপর নির্ম্মিত আটটি স্তূপ ভেঙে ফেলে তার জায়গায় চুরাশি হাজার স্তূপ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন এবং সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী সাতটি স্তূপ ভেঙে যখন এই অষ্টম স্তূপটি ভাঙতে আসেন তখন এই নাগদৈত্যটি অশোককে তাঁর প্রাসাদস্থিত বুদ্ধদেবের পূতাস্থি নিবেদনার্থে রক্ষিত অর্পণপাত্রগুলি দেখান। রাজা অশোক পাত্রগুলি দেখে বুঝতে পারেন যে, পাত্রগুলি মর্ত্তের নয়, বোধ হয় স্বর্গের। এইসব দেখে অশোক আর স্তূপটি না ভেঙে ভগ্নহৃদয়ে এখান থেকে বিদায় নেন। এই ঘটনার পর থেকে এই অঞ্চলটি একেবারে জনশূন্য হয়ে যায়। এমন কি নাগদৈত্যটি পর্য্যন্ত এখান ছেড়ে চলে যায়; কেবলমাত্র একদল হস্তীকে এই স্তূপের কাছে আসতে দেখা যায়। তারাই তাদের শুঁড়ে করে জল ও পুষ্পাদি এনে এই স্তূপটির চারিধারে ছড়িয়ে দেয়। কোন এক সময় একজন বিদেশী ভিক্ষু এই স্তূপ পরিদর্শন করতে এসে খুবই বিমর্ষিত হন এবং স্তূপটি দেখাশুনা করার উদ্দেশ্যে এখানেই থেকে যান। তাঁর এই প্রচেষ্টা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে এদেশের রাজা এখানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করে দেন যেখানে আজও অনেক ভিক্ষু বাস করছেন। বিহারের প্রধান কিন্তু এখনও একজন বিদেশী ভিক্ষুই।

এখান থেকে চার যোজন পথ এগিয়ে গেলেই একটি ভগ্নস্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। স্তূপটি বুদ্ধের 'পরিনির্ব্বাণলাভের' পর যেখানে তাঁকে দাহ করা

হয়েছিল, সেই স্থলের ওপরই রচিত হয়েছিল এরই বার যোজন দূরবর্তী কুশী নগরে।

নদীর তীরে উত্তরমুখী মাথা রেখে বুদ্ধদেব 'পরিনির্ব্বাণলাভ' করেছিলেন। এখানেও অনেকগুলি স্তূপ আছে। তার মধ্যে যেখানে বুদ্ধদেব তাঁর জীবনের সর্ব্বশেষ শিষ্য সুভদ্রকে দীক্ষা দেন। যেখানে বুদ্ধের দেহ 'পরিনির্ব্বাণলাভের' পর সাত দিন ধরে সার্ব্বজনীন প্রদর্শনার্থে একটি সোনার আধারে রাখা হয়েছিল এবং যেখানে বজ্রপানি তাঁর স্বর্ণদণ্ড পরিহার করেন—সেই স্থানের ওপর নির্ম্মিত স্তূপগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তীর্থযাত্রীরা এর পর এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বার যোজন পথ অতিক্রম করে বৈশালী রাজ্যের সীমান্ত নগরে এসে পৌঁছলেন। বুদ্ধদেব 'পরিনির্ব্বাণলাভের' জন্য এখান থেকেই যাত্রা করেন। এই যাত্রাপথের সঙ্গী হবার জন্য লিচ্ছবীরা যখন তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ায় তখন তিনি কোন উপায়ান্তর না দেখে সেখানে একটি পরিখার সৃষ্টি করেন যাতে লিচ্ছবীরা সেই পরিখা পার হতে না পারে। বুদ্ধদেব যাত্রাপূর্ব্বে তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি লিচ্ছবীদের দান করে যান এবং বলেন যে এই দানকেই যেন তারা তাদের সংসারে ফিরে যাবার জন্য তাঁর (বুদ্ধদেবের) নির্দ্দেশরূপে মেনে নেন। লিচ্ছবীদের তিনি এই ভাবেই তাঁর সহযাত্রী হওয়ার বাসনা থেকে নিরস্ত করেছিলেন। পরে এখানে একটি প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয়। এই স্তম্ভগাত্রে উপরোক্ত ঘটনাবলীর বিবরণ খোদিত আছে। এখান থেকে তীর্থযাত্রীরা বৈশালী নগরের দিকে অগ্রসর হন এবং দশ যোজন পথ অতিক্রম করে বৈশালী নগরে গিয়ে পৌঁছন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এই বৈশালী নগরেরই উত্তর দিকে বনমধ্যস্থিত একটি দ্বিতল বিহারে বুদ্ধদেব তাঁর শেষ দিনগুলি কাটিয়েছেন এর নিকটবর্ত্তী আরও একটি বিহার আছে সেটি অম্বপালী[১] নাম্নী একটি বেশ্যা বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এর কাছাকাছি একটি স্তূপও আছে যেটি বুদ্ধশিষ্য আনন্দের পূতাস্থির ওপর নির্ম্মাণ করা হয়েছিল।

নগরের দক্ষিণ দিকে একটি বাগান আছে। এটি অম্বপালীই বুদ্ধদেবকে দান করেছিলেন। বুদ্ধদেব 'পরিনির্ব্বাণলাভ' করার জন্য এই নগরী ছেড়ে যখন চলে যান, তখন নাকি তিনি উক্তি করেছিলেন যে, "মরজগতে এই নগরীই তাঁর শেষ কর্ম্মস্থল।"

নগরীর উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি স্তূপ আছে যার নামকরণ করা হয়েছে "অস্ত্রশস্ত্র নিবৃত্তি স্তূপ"। এই নামকরণের পিছনে পুরাকালের একটি ইতিবৃত্ত

১। অম্বপালী (আম্রপালী? আম্রধারিকা?) অর্থাৎ আমবাগানের পরিচারিকা। বৌদ্ধদের কাছে আমবাগান একটি তীর্থস্থানবিশেষ। অম্বপালী এক রাজনটী ছিলেন। ইনি অনেকবার নরক দর্শন করেছেন। ইনি প্রায় লক্ষবার নারীভিখারী হয়ে জন্মেছেন এবং দশ হাজার বার বেশ্যা জীবন যাপন করেছেন। ইনি কশ্যপবুদ্ধের সময় থেকে বরাবর এই মর্ত্ত্য-ভূমিতে জন্মে এসেছেন। একবার ইনি দেবী হিসাবেও জন্মেছেন, কিন্তু ইনি শেষবারের মতন পৃথিবীতে যখন জন্মান তখন বৈশালীর আম্রবৃক্ষের তলাতেই জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পৃথিবীতে এসে পুনরায় বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং রাজা বিম্বিসারের ঔরসে এঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মায়। শেষপর্য্যন্ত বুদ্ধদেব এর মনকে জয় করে নেন এবং ইনি ভোগ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে সাধনের দ্বারা অর্হতের পর্য্যায়ভুক্ত হন (Travels of Fa-hien, p. 72)।

আছে। ইতিবৃত্তটি হচ্ছে—কোন এক সময়ে এই দেশের রাজার দুয়োরাণী একবার অসময়ে একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। রাজার সুয়োরাণী ঈর্ষা-পরবশ হয়ে এই সময় রাজাকে এই অমঙ্গলকর পিণ্ডটি অবিলম্বে বিনষ্ট করে ফেলবার উপদেশ দেন এবং রাজাও তাঁর কথামত সেই মাংসপিণ্ডটি এক বিরাট কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরে নদীতে ফেলে দেন। এই রাজ্যের প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা একদা নদীতীরে পরিভ্রমণকালে এই কাঠের বাক্সটাকে ভেসে যেতে দেখে কৌতূহলপরবশ হয়ে সেটিকে নদী থেকে তীরে নিয়ে আসেন এবং ডালা খুলে বাক্সের মধ্যে প্রায় এক সহস্র সুন্দর নবজাত শিশুকে দেখতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে যান ও উপযুক্ত পরিচর্য্যা সহকারে মানুষ করতে থাকেন। কালে এই সহস্র শিশুই সহস্র বীর পুরুষে পরিণত হয় ও বিভিন্ন দেশ জয় করে তারা অপরাজেয় যোদ্ধা হিসাবে চতুর্দ্দিকে খ্যাতিলাভ করে। অবশেষে তারা অজান্তে তাদের পিতৃরাজ্য আক্রমণ করতেই উদ্যত হয়। রাজা এই সংবাদ পেয়ে খুবই বিমর্ষিত হন এবং দুয়োরাণী যখন রাজাকে তাঁর এই বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করে সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হন তখন তিনি রাজাকে অভয় দেন এবং অনুরোধ করেন যে নগরীর সীমান্তে একটি সু-উচ্চ মণ্ডপ তৈরী করে তাঁকে (দুয়োরাণীকে) যেন সেই মণ্ডপের উপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়—তা হলেই তিনি শত্রুপক্ষদের যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হবেন। রাজাও তাঁর পরামর্শমত সব কিছু করে দুয়োরাণীকে মঞ্চের উপরে উঠিয়ে দেন। যখন সেই সহস্রবীর মঞ্চের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছায় তখন দুয়োরাণী তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, "হে আমার পুত্রেরা তোমরা এরূপ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছ কেন?" এর প্রত্যুত্তরে সহস্র কণ্ঠ দাবী করে "প্রমাণ কি যে তুমি আমাদের মা"? দুয়োরাণী তখন বলে, "প্রমাণ আমি দিচ্ছি। তোমরা সবাই হাঁ করে আমার দিকে তাকাও।" তারা সবাই সেইরূপ করলে পর দুয়োরাণী তাঁর বুকের কাপড় সরিয়ে তাঁর স্তনযুগল দু-হাতে টিপতেই স্তন থেকে অফুরন্ত দুগ্ধ বেরিয়ে সেই সহস্র মুখে গিয়ে পড়তে

থাকে। এই ঘটনার পর বিদ্রোহীরা বুঝতে পারে সত্য সত্যই তারা তাদের পিতৃরাজ্য আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তখন তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সব মাটীতে নামিয়ে রাখে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দুই রাজাই প্রত্যেক বুদ্ধে পরিণত হন। বুদ্ধদেব বুদ্ধত্বলাভের পর এই স্থান পরিদর্শনকালে তাঁর শিষ্যদের জানান যে, "এই স্থানেই আমি আমার অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করেছিলুম।" আসলে এই সহস্র পুত্রই ভদ্রকল্পের সহস্র বুদ্ধ। অস্ত্রশস্ত্র নিবৃত্তি-স্তূপের পাশে দাঁড়িয়েই বুদ্ধদেব আনন্দকে জানিয়েছিলেন যে, আর তিন মাস পরেই তিনি 'পরিনির্ব্বাণলাভ' করবেন। আনন্দের যদিও ইচ্ছা হয়েছিল বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি আরও বেশী দিন থাকতে পারছেন না, কিন্তু রাজা মর২ তাকে এমন বোবা করে দিয়েছিল যে তিনি বুদ্ধদেবকে এই প্রশ্নটি করতে সক্ষম হয় নি।

এই স্তূপের পূর্ব্বদিকে আরও একটি স্তূপ আছে। বুদ্ধের 'পরিনির্ব্বাণলাভের' সহস্র বৎসরকাল অতিবাহিত হবার পর দেখা যায় যে বৈশালী ভিক্ষুদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে দশটি নিয়মাবলী ঠিক ভাবে মেনে চলা হচ্ছে না তাই

২। ইনি দৈত্যকুলের প্রধান। ধর্ম্মবিনাশ, ভালবাসা, পাপ ও মৃত্যুর এবং অসৎ কর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ইনি কামধাতু পর্ব্বতের শীর্ষদেশে 'পারমিতা বসাবর্ত্তিন স্বর্গে' ইনি বাস করেন। ইনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন। অনেক সময় ভীতি প্রদর্শনার্থে ইনি দৈত্যের মূর্ত্তিতেই দেখা দেন। সময় সময় ইনি সহস্র হস্ত নিয়ে হস্তীচালনারত মূর্ত্তিতেই কল্পিত হন। কথিত আছে বুদ্ধদেব নাকি বলেছিলেন যে আনন্দ যদি তাঁকে তিনবার এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন তাহলে তিনি তাঁর 'পরিনির্ব্বাণ' সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতেন (Travels of Fa-hien by Legge, p. 74)।

হিন্দুদের যমরাজার সঙ্গে বৌদ্ধদের মররাজার অনেকখানি মিল রয়েছে বলেই মনে হয়, তবে সবটা নয় কারণ অনেক ক্ষেত্রে যমরাজাকে ধর্ম্মরাজ-রূপেও অভিহিত করা হয়েছে।—অনুবাদক

নিয়মাবলীর সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সাত শত জন ভিক্ষু ও অর্হৎ এখানে বসেই বৌদ্ধশাস্ত্র-নিয়মাবলীর নতুন করে ব্যাখ্যা করে নিয়মাবলীর পুনঃসংস্কার করেন। এই ঘটনার স্মারক হিসাবেই স্তূপটি রচিত হয়।

এখান থেকে তীর্থযাত্রীরা পূর্ব্বদিকে চার যোজন পথ অতিক্রম করে পঞ্চ-নদীর সঙ্গমে এসে পৌঁছন। যখন আনন্দ মগধ থেকে 'পরিনির্ব্বাণলাভ' করার উদ্দেশ্যে বৈশালীর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তখন রাজা অজাতশত্রু দেবতাদের মারফত সংবাদ পেয়ে একদল দেহরক্ষী নিয়ে স্বয়ং এই সঙ্গমে এসে পৌঁছান। অপর দিক থেকে লিচ্ছবীরাও এসে পৌঁছান। আনন্দ কাউকেই অসন্তুষ্ট করতে রাজী ন'ন, তাই তিনি নদীমধ্যেই তার সমাধি রচনা করেন এবং তার দেহ বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগ নিয়ে যান অজাতশত্রু ও অপর ভাগ নিয়ে যান লিচ্ছবীরা এবং উভয় পক্ষই সেই পূতাস্থির উপর ভবিষ্যৎকালে স্তূপ রচনা করেন।

নদী পার হয়ে তীর্থযাত্রীরা দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হয়ে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে এসে পৌঁছান।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এই সেই পাটলিপুত্র যেখানে বসে রাজা অশোক তাঁর রাজ্য-শাসনকার্য্য পরিচালনা করতেন। নগরীর মধ্যস্থলে এখনও দেখতে পাওয়া যায় তাঁর রাজপ্রাসাদ ও সভাগৃহগুলি। যদিও সেগুলি খুবই পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে গেছে তবুও যে সূক্ষ্ম স্থাপত্যশিল্প এখনও তাদের মাঝে দেখা যায় সেগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, জাগতিক কোন মানবের পক্ষেই এরূপ নির্ম্মাণকার্য্য সম্ভব নয়। কথিত আছে, রাজা অশোক দৈত্যদের দ্বারাই এইসব প্রাসাদ ও সভাগৃহগুলি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন।

রাজা অশোকের এক কনিষ্ঠ ভাই ছিলেন। তিনি রাজগৃহের নিকট গৃধ্রকূট পর্ব্বতে বাস করতেন। কারণ, নগরীর কোলাহল তাঁর মোটেই ভাল লাগত না। অনেকের মতে তিনি অর্হতের পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। রাজা অশোক অনেকবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে কিন্তু সফলকাম হ'ন নি। এমনকি দৈত্যদের দ্বারা প্রাসাদের মধ্যেই একটি ছোট পর্ব্বতগুহাও তাঁর ভাইয়ের জন্য তৈরি করিয়ে ছিলেন।

এই পাটলিপুত্রেই রাধাস্বামী নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি বুদ্ধের অনুরক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। সেইজন্য দেশের রাজা থেকে স্থরু করে সবার তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। দেশের রাজা এঁরই কাছ থেকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনতেন। রাজা এঁকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন তেমনি ভয়ও করতেন। সাহস করে রাজা এঁর পাশে বসতে পারতেন না। একমাত্র এঁরই জন্য তদানীন্তন কালে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিশেষ ক্ষতিসাধন করতে সাহসী হ'ননি বা পারেন নি।

এখানে অশোকের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত অশোকস্তূপের পার্শ্বেই দুটি বিহারও নির্ম্মিত হয়েছে। একটিতে মহাযানপন্থী ও অপরটিতে হীনযানপন্থী ভিক্ষুরা

বাস করেন। সর্ব্বসমেত প্রায় ৭ শত ভিক্ষু এখানে বাস করেন। এই বিহার দুটিতে প্রচলিত নিয়মাবলী সত্যই প্রশংসার যোগ্য এবং বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। বিভিন্ন দেশের শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুরা দলে দলে এখানে এসে ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিহারের নিয়মাবলী শিক্ষা গ্রহণ করে যান। এই দুটি বিহারের একটিতে মঞ্জুশ্রী নামে একজন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ শিক্ষক ছিলেন যাঁকে রাজ্যের সবাই বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

মধ্যরাজ্যের মধ্যে পাটলিপুত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর। এখানকার লোকেরা যেমন সুখী ও সম্পদশালী সেইরূপ পরহিতব্রতী। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মঙ্গলচিন্তা করেন। বৈশ্যপ্রধানেরা নগরীর বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। সেখান থেকে বিনামূল্যে ঔষধাদি দেওয়া হয়ে থাকে। দরিদ্র অনাথ আতুরদের খাওয়া-দাওয়া ও চিকিৎসালয়ের থাকার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসকেরা বেশ যত্নসহকারেই তাঁদের রোগাদি পরীক্ষা করে যথাযোগ্য ঔষধাদি প্রদান করেন ও একেবারে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে না গেলে রোগীদের চিকিৎসালয় ছেড়ে যেতে দেন না।

রাজা অশোক বুদ্ধের পূতাস্থির উপর নির্ম্মিত ৭টি স্তূপ ভেঙ্গে যখন ৮৪ হাজার স্তূপ নির্ম্মাণ করার সংকল্প করেন, তখন তিনি প্রথম স্তূপ নির্ম্মাণ করেন এই নগরেরই দক্ষিণ দিকে। স্তূপের সামনেই একটি স্থানে বুদ্ধের একটি পদচিহ্ন আছে যার পাশে রাজা অশোক একটি বিহার নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন। বিহারের দক্ষিণ দিকে একটি ১৫ ফুট চওড়া ও ৩০ ফুট উঁচু শিলাস্তম্ভ আছে এবং সেই স্তম্ভের গায়ে লেখা আছে যে, "অশোক জম্বুদ্বীপকে ভিক্ষুদের দান করে পরে অর্থ দিয়ে আবার তা কিনে নেন। এই রকম ভাবে পর পর তিনবার তিনি জম্বুদ্বীপকে কিনে নেন।"

স্তম্ভটির প্রায় ৪০০ হাত দূরে অশোক 'নিরয়' বলে একটি নগরীর পত্তন করেন। সেখানেও একটি শিলাস্তম্ভ আছে যার শীর্ষদেশে একটি সিংহমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এই নগরী কেন নির্ম্মাণ করা হয়েছিল এবং নির্ম্মাণ

করতে কতদিন লেগেছিল তার বিবরণও এই শিলাস্তম্ভে খোদিত করা আছে।

তীর্থ যাত্রীরা এখান থেকে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে নয় যোজন পথ অতিক্রম করে একটি ছোট নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে এসে পৌঁছান। পাহাড়ের শীর্ষদেশে একটি দক্ষিণমুখী গুহা১ আছে। সেখানে দেবরাজ ইন্দ্র প্রেরিত বীণাবাদক পঞ্চশিখ বীণা বাজিয়ে বুদ্ধদেবকে শুনিয়েছিলেন। এই পাহাড়ে বসেই দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে ২৪টি প্রশ্ন করেছিলেন এবং বুদ্ধদেব প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় পাহাড়ের গায়ে একটি করে দাগ কেটেছিলেন। দাগগুলি এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

এখান থেকে তীর্থযাত্রীরা এক যোজন দূরবর্ত্তী শারিপুত্রের জন্মস্থান কলা-পিণক গ্রামে এসে পৌঁছান। শারিপুত্র তাঁর জীবনের শেষদিনে 'পরিনির্ব্বাণ' লাভের উদ্দেশ্যে এখানেই পুনরায় ফিরে আসেন। এই উপলক্ষে এখানে একটি স্তূপও পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত হয়েছে।

১। হিউ এন চাঙ্গ এই গুহাটিকে 'ইন্দ্রশিলা গুহা' বলে উল্লেখ করেছেন (Travels of Fa-hien, p. 80)।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এর পর তীর্থযাত্রীরা রাজা অজাতশত্রুর নূতন রাজধানী রাজগৃহে এসে পৌঁছান। নগরীর পশ্চিম দ্বারের ৩০০ হাত দূরে অজাতশত্রু বুদ্ধের পূতাস্থি নিয়ে ফিরে এসে তার উপর একটি স্তূপ রচনা করেন। স্তূপটি যেমন বড়, দেখতে তেমনি সুন্দর। নগরীর দক্ষিণ দ্বারের বাইরে কিছুদূর অগ্রসর হলেই একটি উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায় যার পাঁচ ধার ঘিরে রয়েছে পাঁচটি পাহাড়। সেগুলিকে নগরীর শৃঙ্গদ্বার হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। এইখানেই ছিল রাজা বিম্বিসারের পুরাতন রাজগৃহ। এই রাজগৃহেই শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন অশ্বজিতকে দেখেন, নিগ্রন্থ বুদ্ধের জন্য বিষাক্ত ভাত রান্না করেন এবং রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধকে আঘাত করার নিমিত্ত একটি কালহস্তীকে সুরা-পান করান। নগরীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অম্বপালী জীবক[১] উদ্যানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করে বুদ্ধদেব ও তাঁর ১,২৫০ জন শিষ্যকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। এখন কিন্তু এর চিহ্নমাত্রও নেই সবই ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে এবং নগরী জনশূন্য হয়ে গেছে। উপত্যকার মধ্যে প্রবেশ করে পাহাড়গুলোকে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে রেখে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তীর্থযাত্রীরা গৃধ্রকূট পর্ব্বতের কোণে এসে পৌঁছান। পর্ব্বতের শীর্ষদেশের নিকটবর্ত্তী একটি গুহা আছে যেখানে বুদ্ধদেব সমাধিতে বসেছিলেন। এরই কিছুদূরে আনন্দও সমাধিতে বসেছিলেন। কিন্তু রাজা মর গৃধ্রের রূপ ধরে আনন্দের সামনে এসে বসেন, যাতে আনন্দ ভয় পান। বুদ্ধদেব তখন আনন্দের ভয় ভাঙাবার জন্য তাঁর বিশেষ ক্ষমতাবলে পর্ব্বতগাত্রে একটি ফাটলের সৃষ্টি করেন এবং আনন্দের কাঁধে একটি হাত রাখেন। গৃধ্রের পদচিহ্ন ও বুদ্ধের সৃষ্ট ফাটল

১। রাজা বিম্বিসারের ঔরসে অম্বপালীর গর্ভজাত পুত্রের নামও জীবক।—অনুবাদক।

এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘটনা থেকে এই পর্ব্বতের নামকরণ হয় 'গৃধ্রকূট' অর্থাৎ শকুনির গুহা। এই গুহার সামনেই চারিবুদ্ধ সমাধিতে বসেছিলেন। এই পাহাড়েই দেবদত্ত-নিক্ষিপ্ত প্রস্তরে বুদ্ধদেব পায়ে আঘাত-প্রাপ্ত হন। বুদ্ধদেব এখানে যে সভাগৃহে তাঁর ধর্মপ্রচার করেছিলেন এখন সেই সভাগৃহ ধ্বংসপ্রায়। কেবলমাত্র গৃহের ভগ্ন দেওয়ালগুলিই দৃশ্যমান।

ফা-হিয়েন যখন গৃধ্রকূট পর্ব্বতে আরোহণ করে পুষ্প ও ধূপাদি দিয়ে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ ক'রছিলেন তখন দিনরবি গতপ্রায়। রাত্রির নির্জ্জন অন্ধকারে ফা-হিয়েন একাকী সেই গুহার সামনে বসে সারারাত ধরে 'সুরঙ্গম সূত্র' পাঠ করেন এবং পরদিন সূর্য্যোদয়ের পর নূতন রাজগৃহে ফিরে আসেন।

ফিরতি পথে ফা-হিয়েন 'কারণ্ড বেণুবন' অর্থাৎ বাঁশবাগান দেখতে পেয়ে-ছিলেন। সেখানে এখনও একটি বিহারে কিছুসংখ্যক ভিক্ষুর বাস আছে। এর কিছুদূরে আরও একটি গুহা আছে যার নামকরণ করা হয়েছে 'পিপুল গুহা'। বুদ্ধদেব সাধারণত মধ্যাহ্ন ভোজের পর এই গুহাতেই সমাধিতে বসতেন। এরই কিছু দূরে 'সপ্তপর্ণি গুহাটি' অবস্থিত। বুদ্ধের 'পরিনির্ব্বাণ লাভের' পর ৫০০ অর্হৎ এখানে বসেই বৌদ্ধ সূত্রগুলি সঙ্কলন করার জন্য মিলিত হন। এই সভা পরিচালনা করেছিলেন মহাকাশ্যপ, এবং শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন উভয়েই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আনন্দ গুহাদ্বারেই দাঁড়িয়েছিলেন; কারণ তিনি সভায় ঢুকতে পারেন নি২।

এর পর তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে ৪ যোজন দূরবর্ত্তী গয়া নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

২। এটা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি যে, এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম্মসভায় আনন্দের মত এত বড় একজন অর্হৎকে কেউ আহ্বান করে সভামণ্ডপে নিয়ে যান নি এবং সভার কার্য্য আনন্দকে বাদ দিয়েই পরিচালিত হয়েছিল ?—অনুবাদক।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রীরা গয়া নগরীতে পৌঁছে দেখেন নগরী প্রায় জনশূন্য। সেখান থেকে তীর্থযাত্রীরা আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে সেই স্থানে এসে পৌঁছান (বুদ্ধগয়া), যেখানে একদা বুদ্ধদেব বহু কৃচ্ছ সাধনের পর সমাধিমগ্ন হয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন।

প্রথমে একটি উত্তর পূর্ব্বমুখী শিলাখণ্ডের উপর বোধিসত্ত্ব পা মুড়ে বসে নিজের মনেই বলেছিলেন যে, "যদি আমাকে বুদ্ধত্বলাভ করতে হয় তা হলে বুদ্ধের একটি প্রতিচ্ছায়া আমার সম্মুখে দৃশ্যমান হোক্।" এই কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শিলাখণ্ডের গায়ে তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বুদ্ধের প্রতিচ্ছায়া প্রতিফলিত হয় যা আজও দেখতে পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্ব তপস্যায় বসবার উদ্যোগ করতেই দৈববাণী হয় যে, "বুদ্ধত্ব লাভ করতে গেলে এখানে বসলে চলবে না ; এখান থেকে অৰ্দ্ধ যোজন দূরে পত্রবৃক্ষের তলে তপস্যায় বসতে হবে। কারণ ঐ বৃক্ষতলে বসেই পূর্ব্ববর্ত্তী বুদ্ধেরা বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন।" এর পর দেবতারা বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে করে নিয়ে এগিয়ে যান। মধ্যপথে একজন দেবতা ভূমি থেকে একগাছা কুশ ছিঁড়ে নিয়ে বোধিসত্ত্বকে দিয়ে বলেন যে, এই কুশই সফলতার নিদর্শন স্বরূপ। বোধিসত্ত্ব কুশগ্রহণের পর প্রায় ৫০০ হাত এগিয়ে যান এবং পত্রবৃক্ষের তলে ভূমিতে কুশগাছটি রেখে পূর্ব্বমুখী হয়ে তপস্যায় বসেন। এই সময় রাজা মর তাঁকে প্রলুব্ধ করার জন্য তিনটি অনন্যাসুন্দরী নারীকে বোধিসত্ত্বের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজেও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হ'ন। বোধিসত্ত্ব তখন তাঁর পায়ের গোড়ালিটি একবার ভূমিতে ঠোকেন, যার ফলে মর রাজার সঙ্গীরা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তিনজন নারীও বৃদ্ধায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বুদ্ধদেব বুদ্ধত্বলাভের পর সাতদিন ধরে পত্রবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে থেকে বিমুক্তিলাভের আনন্দ

উপভোগ করেন। ভবিষ্যৎকালে উপরোক্ত প্রত্যেকটি স্থলেই স্তূপ নির্ম্মিত হয়। এ ছাড়া আরও অনেক স্তূপ রচিত হয়েছে সেইসব স্থানে যেখানে দেবতারা বুদ্ধদেবকে সাতদিন ধরে পূজা করেছিলেন; যেখানে অন্ধ দৈত্য মুচলিন্দ বুদ্ধদেবকে সাত দিন ধরে আটকে রেখেছিলেন; যে ন্যগ্রোধ বৃক্ষতলে বসে বুদ্ধদেব দেবলোকের ব্রহ্মার শ্রদ্ধার্ঘ গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে ৫০০ বণিক তাঁকে সেঁকা রুটি ও মধু খেতে দিয়েছিলেন। যেখানে দেবরাজরা তাঁদের ভিক্ষা পাত্র বুদ্ধের সম্মুখে এনে হাজির করেছিলেন এবং যেখানে কাশ্যপ ও তাঁর সহস্র সঙ্গীকে বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দেন। এই সব স্থানের উপর নির্ম্মিত স্তূপগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনটি বিহারও আছে যেখানে ভিক্ষুরা এখনও বাস করছেন। এখানকার অধিবাসীরাই ভিক্ষুদের খাদ্যশস্যাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে থাকেন। বিহার-জীবন-যাপনের নিয়মাবলী এখানকার ভিক্ষুরা বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

বুদ্ধদেব যে পত্রবৃক্ষের তলায় বসে বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন সেই বৃক্ষ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ চলিত আছে। প্রবাদটি হচ্ছে এই যে, পূর্ব্ব জন্মে রাজা অশোক যখন শিশু ছিলেন তখন তিনি একবার পথিপার্শ্বে খেলা করবার সময় শাক্য-মুনি বুদ্ধকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ভিক্ষা করতে দেখেছিলেন এবং শিশু অশোক তাঁর সৌম্যমূর্ত্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে একমুঠো মাটি বুদ্ধকে ভিক্ষা দেন। বুদ্ধ সেই মাটি তাঁর চলার পথে ছড়িয়ে দেন। এই শুভকর্ম্মের জন্যই পরজন্মে অশোক জম্বুদ্বীপের শাসনকর্ত্তা ও রাজচক্রবর্ত্তীরূপে অধিষ্ঠিত হন। রাজত্ব পাবার পর অশোক একবার রাজ্য পরিদর্শনে বেরিয়ে পর্ব্বতবেষ্টনীর মধ্যে একটি নরক দর্শন করেন। এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর পারিষদবর্গকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, এই নরক তৈরী করেছেন যমরাজা এবং এখানেই তিনি দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। এই কথা শোনার পর রাজা অশোক পৃথিবীর অধীশ্বর হিসাবে তাঁর রাজ্যের দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তিদানের নিমিত্ত

অনুরূপ একটি নরক তৈরী করার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে' স্থির করেন এবং তা' কাজেও পরিণত করেন। এর পর দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে ঘিরে তিনি একটি নরক তৈরী করান এবং তাঁর রাজ্যের সবচেয়ে নিষ্ঠুর একটি লোকের উপর এই নরকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন।

একবার একজন ভিক্ষু ভিক্ষা সমাপ্ত করে কিরকম ভাবে এই নরকের মধ্যে ঢুকে পড়েন। নরকের রক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ধরে ফেলে ও তাদের প্রথানুযায়ী তাঁর উপর নির্য্যাতন সুরু করে। রক্ষীরা তাঁকে একটি ফুটন্ত জলের লৌহনির্ম্মিত কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ভিক্ষুটিকে জলে নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে জলাধার একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে আসে এবং চুল্লীর অগ্নিও নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। রক্ষীরা আরও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করে যে, লৌহ-কুয়ার মধ্য থেকে উদ্ভূত একটি পদ্মফুলের উপর ভিক্ষুটি মহাসন্তোষে বসে আছেন। রাজাকে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা জানালে, তিনি নিজে সেই নরকে আসেন এবং ভিক্ষুটির কাছ থেকে ধর্ম্মোপদেশ শোনেন। অশোক তখন তাঁর এই নিষ্ঠুর খেলার কথা স্মরণ করে বিশেষভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়েন এবং সমগ্র নরকটি ভূমিসাৎ করে দেন। এর পর রাজা চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রায়ই এই বোধিবৃক্ষতলে এসে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আকুল প্রার্থনা জানাতেন যাতে তাঁর চিত্তশুদ্ধি ঘটে ও তাঁর পাপস্খালন হয়। রাজার এই পুনঃপুনঃ রাজপ্রাসাদে অনুপস্থিতি দেখে রাণী বিশেষ চিন্তিত হন এবং যখন তিনি খবর নিয়ে জানতে পারেন যে, রাজা এই পত্রবৃক্ষতলেই বেশীর ভাগ সময় সমাধিতে কাটান তখন শত্রুতাবশে তিনি লোক লাগিয়ে এই বৃক্ষটি কাটিয়ে দেন। রাজা এই সংবাদ পেয়ে এই বৃক্ষমূলের সম্মুখে এসে ভূমিতলে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, বৃক্ষটিতে যদি আবার জীবনের কোন চিহ্ন না দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে তিনি ঐ অবস্থাতেই মৃত্যুকে বরণ করবেন। এই শপথ গ্রহণের পর এক সহস্র কলসী গো-দুগ্ধ বৃক্ষমূলে ঢালা হলে পর পুনরায় বৃক্ষটির সজীবতার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে সেই

বৃক্ষই তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিজের ছায়াতলে ঢেকে রেখেছে। রাজা অশোক এই বৃক্ষের চার ধারে সুউচ্চ একটা প্রাচীর গেঁথে দেন যাতে কেউ এর কোনরূপ ক্ষতি করতে না পারে।

তীর্থযাত্রীরা এর পর দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হয়ে গুরুপদ পাহাড়ের কোণে এসে পোঁছান। এই পাহাড়ের মধ্যে মহাকাশ্যপের দেহ এখনও সমাহিত আছে। পাহাড়ের মধ্যে একটি ফাটল আছে। সেই ফাটল ধরে নীচে নেমে গেলে একটি গর্ত দেখতে পাওয়া যায় এবং এই গর্তের মধ্যেই সেই দেহ সমাধিস্থ হয়ে আছে। এই পাহাড়ের মাটির একটি বিশেষ গুণ যে, একটু মাটি নিয়ে মাথায় ঘষে দিলেই মাথার যন্ত্রণার উপশম হয়। পাহাড়ের আশেপাশে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের উপদ্রব খুবই বেশী। তাই লোকেরা এ-অঞ্চলে খুব সাবধানে চলাফেরা করে থাকেন।

তীর্থযাত্রীরা এর পর পুনরায় পাটলীপুত্রে ফিরে যান।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রীরা পাটলীপুত্র হয়ে গঙ্গার তীর ধরে প্রথমে 'অটবী বিহার' ও পরে বারাণসী নগরীতে এসে পৌঁছান এই বারাণসীর কিছু দূরে একটি ঋষিদের বিশ্রামের জন্য উদ্যান আছে। এই উদ্যানে একজন বুদ্ধ বাস করতেন। তিনি দৈববাণী শুনেছিলেন যে, রাজা সুদ্ধোধনের পুত্র সংসারত্যাগী হয়ে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন এবং খুব শীঘ্রই তিনি বুদ্ধত্বলাভ করবেন। দৈববাণী শোনার পরমুহূর্ত্তেই তিনি 'নির্ব্বাণলাভ' করেন। বুদ্ধদেব এইখানেই কৌণ্ডিন্য ও তার চারিজন সঙ্গীকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দেন। এখান থেকে তের যোজন দূরে 'ঘোষির বন' নামে একটি বিহার আছে। বুদ্ধদেব কিছুকাল এই বিহারে বাস করেছিলেন। এখনও কিছুসংখ্যক হীনযানপন্থী ভিক্ষু এই বিহারে বাস করছেন।

তীর্থযাত্রীরা এর পর দক্ষিণমুখে দুই শত যোজন পথ অতিক্রম করে একটি বিহারে এসে পৌঁছান। বিহারটি কাশ্যপ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে অর্পিত। একটি পাহাড় কেটে এই পাঁচতলা বিহারটি নির্ম্মাণ করা হয়েছে। সর্ব্বনিম্ন তলাটি দেখতে অনেকটা হস্তীর মত এবং এই তলায় প্রায় পাঁচ শত ঘর আছে; দ্বিতীয় তলাটির আকৃতি সিংহের মত এবং ঘর আছে প্রায় চারি শতটি; তৃতীয় তলাটির আকৃতি অশ্বের মত এবং এই তলায় প্রায় তিন শতটি ঘর আছে; চতুর্থ তলাটি ষণ্ডাকৃতি এবং ঘর আছে প্রায় দুই শতটি; পঞ্চম তলাটির আকৃতি পায়রার মত এবং ঘর আছে প্রায় একশতটি। প্রত্যেক তলাতেই সংলগ্ন সিঁড়ি আছে। এই বিহারের নির্ম্মাণ-প্রণালী এতই চমৎকার যে, বিহারের প্রত্যেকটি ঘরেই প্রচুর আলো ও বাতাস যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাহাড়ের ওপর একটি ঝর্ণা আছে। তার জল উপর থেকে গড়িয়ে প্রতিটি তলায় প্রতিটি ঘরের সামনে দিয়ে নীচে বিহার-প্রাঙ্গণে এসে

পড়ে ও নালী দিয়ে বিহারের বাইরে চলে যায়। বিহারটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'পারাবত-বিহার।'

ভারতের এই অঞ্চলের ভূমি অনুর্ব্বর এবং মোটেই কৃষিযোগ্য নয়। সেই কারণেই বোধ হয় এই অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত জনহীন। বিহারের বহু দূরে কয়েকটি গ্রাম আছে। সেখানকার লোকেরা না বৌদ্ধধর্ম্মে না ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে বিশ্বাসী। এখানকার পথ-ঘাটও বিপজ্জনক। এখানকার রাজাকে প্রচুর অর্থ দিলে পর তিনি তাঁর রক্ষীদের পথিকদের রক্ষার জন্য নিযুক্ত করে থাকেন। রক্ষীরাই পথিককে পাহাড় দিয়ে নিরাপদে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। ফা-হিয়েন দক্ষিণ ভারতের এই অঞ্চলটি সবটা ঘুরে দেখতে সক্ষম হন নি এবং তিনি উপরোক্ত তথ্যাদি যাঁরা এই পথে যাতায়াত করছেন তাঁদের মুখেই শুনেছেন।

তীর্থযাত্রীরা এর পর পুনরায় বারাণসী হয়ে পাটলিপুত্রে ফিরে আসেন। ফা-হিয়েনের পাটলিপুত্রে ফিরে আসার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে 'বিনয় পিটকের' একটি পুঁথি সংগ্রহ করা। উত্তর ভারত পরিভ্রমণকালে ফা-হিয়েন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিহার-নিয়মাবলীর সন্ধান পান, কিন্তু সেইসব নিয়মাবলী কোন পুঁথিতে বিধিবদ্ধ করা হয়নি। এগুলি যুগ যুগ ধরে মুখে মুখে প্রচারিত, সংবর্দ্ধিত ও সংরক্ষিত হয়ে এসেছে। এই কারণেই ফা-হিয়েনকে এই পুথির জন্য মধ্যভারতেও বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। তিনি মধ্যভারতের সব কয়টি বিশিষ্ট স্থান ঘুরে শেষে এখানকার 'মহাযান বিহারে' একটি 'বিনয় পিটকের' সন্ধান পা'ন। এই পিটকে 'মহাসাংঘিক' নিয়মাবলী যা বুদ্ধের জীবিতকালে 'প্রথম ধর্ম্মসম্মেলনে' লিপিবদ্ধ ও গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যার মূল পুঁথিটি জেতবন বিহারেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল—সেইটি ফা-হিয়েন এখানে দেখতে পা'ন। এ ছাড়া অন্যান্য ১৮টি পন্থাবলম্বীদের আর কোন নিয়মাবলীই তিনি দেখতে পান নি। তাঁরা তাঁদের গুরুর আদেশ অনুযায়ী নিয়মাদি পালন করে এসেছেন বা এখনও করছেন। 'মহাযান বিহারের' এই

পুঁথিটি সর্ব্বদিক দিয়েই সম্পূর্ণ এবং এর প্রতিটি সূত্রের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। এ ছাড়া ফা-হিয়েন সাত হাজার শ্লোক সমৃদ্ধ 'সর্বাস্তিবাদ' শাস্ত্রের একটি পুঁথিও এখানে দেখতে পান।

ফা-হিয়েন এই বিহারে ছয় হাজার শ্লোকসমৃদ্ধ 'সংযুক্তাভিধর্ম হৃদয় শাস্ত্র', আড়াই হাজার শ্লোকসমৃদ্ধ 'নির্ব্বাণ সূত্র', পাঁচ হাজার শ্লোকসমৃদ্ধ 'বৈপুল্য পরিনির্ব্বাণ সূত্র' এবং 'মহাসাংঘিকাভিধর্ম' পুঁথিও এখানে আছে দেখেছেন। ফা-হিয়েন তিন বছর ধরে এখানে সংস্কৃত, চলিত ও প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন করে, উপরোক্ত সূত্রাবলীর একটি করে প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। ফা-হিয়েন ও তাও-চিং মধ্যরাজ্য পরিভ্রমণকালে এইসব নিয়মাবলীর অধ্যয়ন ও দৈনন্দিন জীবনে তারই প্রতিফলন দেখে বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়ে যা'ন। তাও-চিং এ'সব দেখে এতই মুগ্ধ হ'ন যে, তিনি এই ভারতবর্ষেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। ফা-হিয়েন অবশ্য স্বদেশে অর্থাৎ চীনে এইসব মহামূল্যবান পুঁথির উল্লিখিত অনুশাসন ও নিয়মাবলী প্রচলন করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে একাকীই চীনদেশে ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। যে সঙ্কল্প নিয়ে তিনি দেশ ছেড়ে বেরিয়েছিলেন তা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ হচ্ছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর সোয়াস্তি নেই।

এরপর ফা-হিয়েন একাকীই শাস্ত্রানুলিপিসমূহ নিয়ে এখান থেকে যাত্রা করে গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হতে থাকেন এবং প্রায় ১৮ যোজন পথ অতিক্রম করে তিনি চম্পানগরের দক্ষিণে এসে পৌঁছান। এখানে একটি বিহার আছে যেখানে চারিবুদ্ধ কিছুকাল ধরে বাস করেছিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

এখান থেকে আরও ৫০ যোজন পথ অতিক্রম করে ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্ত নগরীতে এসে পৌঁছান। তাম্রলিপ্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি বৃহৎ বন্দর। ফা-হিয়েন এখানে প্রায় ২২টি বিহার দেখতে পেয়েছিলেন এবং এর প্রত্যেকটিতেই এখনও ভিক্ষুরা বাস করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে বহুল প্রচারিত ও প্রসারিত। ফা-হিয়েন এখানে ২ বৎসর বাস করে অনেক সূত্রের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন এবং বিভিন্ন বৌদ্ধমূর্ত্তির প্রতিকৃতি নকল করেন।

এর পর তিনি একটি বিরাট সওদাগরী জাহাজে করে দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে সমুদ্র যাত্রা সুরু করেন। শীতের পূর্ব্বাভাষ আবহাওয়া দেখা দেওয়ায় সমুদ্রযাত্রার অনুকূল ছিল। সমুদ্রযাত্রার ১৪ দিন পরে ফা-হিয়েন সিংহল দেশে এসে পৌঁছেন। এখানকার অধিবাসীদের মতে তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহলের দূরত্ব প্রায় ৭০০ যোজন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সিংহল রাজ্যের সবটাই একটি দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। এর আশেপাশে আরও প্রায় ১০০টি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপপুঞ্জের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র তলদেশে খুব ভাল জাতের মুক্তা ও দামী দামী পাথর পাওয়া যায়। এদেশের রাজা কর হিসাবে প্রতি দশটি সংগৃহীত মুক্তার মধ্যে তিনটি করে মুক্তা সংগ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করে নেন।

প্রথমে এদেশে বাস করত নাগেরা ও দৈত্য-দানবেরা। তারপর যখন সভ্য মানুষের বসতি হতে সুরু হ'ল, তখন আস্তে আস্তে তারা বনে জঙ্গলে বাসা নিল, এবং সভ্য মানুষের জগতে আর তাদের কোন চিহ্নই দেখতে পাওয়া গেল না। প্রথমে, বিভিন্ন দেশের বণিকেরাই এদেশে বাস করতে আরম্ভ করেন, পরে এঁরাই 'সিংহলী' জাতি বলে নিজেদের পরিচয় দিতে থাকেন। এখানকার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ এবং এখানকার চাষ-আবাদের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নেই। যখন ইচ্ছে খুশী এঁরা চাষ করেন। জমির উর্ব্বরা শক্তি আছে তাই ফসল বেশ ভালই হয়।

বুদ্ধদেব যখন ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসেন, তখন তিনি তাঁর একটা পা রেখেছিলেন রাজনগরীর উত্তরে অপর পা'টি রেখেছিলেন একটি পাহাড়ের চূড়ায়। এর মধ্যকার দূরত্ব হচ্ছে ১৫ যোজন। বুদ্ধের পদচিহ্নের ওপরই এদেশের রাজা একটি ৪০০ ফুট উঁচু স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন। স্তূপটি আজও দেখতে পাওয়া যায়। স্তূপটিকে বেশ সুন্দর করে সোনারূপা, মণিমাণিক্য দিয়ে সাজান হয়েছে। এর পাশেই 'অভয়গিরি' নামে একটি বিহারও রাজা নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন। এই 'অভয়গিরি বিহারে' প্রায় ১০০০ ভিক্ষুর বাস আছে। বিহারের দালানে বুদ্ধের একটি সুন্দর মূর্ত্তিও স্থাপন করা হয়েছে।

এখানে আসার পর ফা-হিয়েনের মনটা স্বদেশের জন্য খুবই বিচলিত হয়। কারণ সেখান থেকে ভারত ভ্রমণে বেরোবার পর এতদিন ধরে কেবল বিদেশীদের সংস্পর্শেই তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। তাঁর কোন স্বজাতির মুখই তিনি দেখতে পান নি। এখানে তিনি স্বদেশের একজন বণিককে দেখে বিচলিত হয়ে পড়েন। এ-দেশের একজন পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা ভারত থেকে পত্রবৃক্ষের একটি ডাল নিয়ে এসে এখানে পুঁতে দেন এবং ভবিষ্যৎকালে সেই ডাল থেকে বৃক্ষটি একটি বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে। এই বৃক্ষের তলাতে আরও একটি বিহার নির্ম্মিত হয়েছে এবং একটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বুদ্ধের একটি দাঁতও সংরক্ষিত আছে।

এদেশের রাজা নিজে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট এবং বেশ সৎভাবেই জীবনযাপন করে থাকেন। এই সিংহলে কখনও কোন দুর্ভিক্ষ হয় নি বা কোন বিদ্রোহ হয় নি। এখানকার ভিক্ষুরা অনেক মুক্তা ও দামী পাথর সংগ্রহ করে তাঁদের বিহারে জমা করে রেখেছেন। এদেশের রাজা একদিন একটি বিহার দেখতে এসে সেইসব মহামূল্যবান রত্নাদি দেখে সেগুলি আত্মসাৎ করার সঙ্কল্প করেন। অবশ্য এর তিনদিন পরেই তিনি তাঁর এই পাপ সঙ্কল্পের কথা ভিক্ষুদের জানিয়ে তাঁদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হ'ন, এবং অনুরোধ করেন যে, ভবিষ্যতে কোন নূতন ভিক্ষু কিংবা কোন রাজা বা র‍্যজকর্ম্মচারীকে ভিক্ষুদের এই সংগ্রহশালা দেখতে দেওয়ার জন্য একটা বিধিনিষেধ যেন ভিক্ষুরা আরোপ করেন।

এখানকার রাস্তাঘাটগুলি যেমন পরিষ্কার তেমনি পরিচ্ছন্ন এখানকার গৃহস্থেরা। নিজেদের ঘর-বাড়ীগুলি এঁরা বেশ সুন্দর করেই সাজিয়ে রাখেন। প্রতি রাস্তার চৌমাথায় একটা করে উপাসনা গৃহ আছে এবং সেখানে মাসের ৮ই, ১৪ই ও ১৫ই তারিখে ভিক্ষুরা সাধারণ অধিবাসীদের ধর্ম্মব্যাখ্যা শোনান। এখানকার অধিবাসীদের মতে, সমগ্র সিংহলরাজ্যে প্রায় ৬০ হাজার ভিক্ষুর বাস আছে, এবং তাঁরা প্রত্যেকেই সাধারণ শস্যাগার

থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যাদি পেয়ে থাকেন। যখনই প্রয়োজন হয় এঁরা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে শস্যাগার থেকে খাদ্যশস্যাদি নিয়ে আসেন।

তৃতীয় মাসের মাঝামাঝি এদেশে রক্ষিত বুদ্ধের দাঁতটিকে নিয়ে এখানে একটি শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রা বার করবার পূর্ব্বে দেশের রাজা একটি ঘোষককে একটি সজ্জিত হস্তীর উপর চাপিয়ে দিয়ে সমগ্র নগরী পরিভ্রমণের আদেশ দেন। ঘোষক তাঁর ঘোষণায় বুদ্ধের জীবনের বিশিষ্ট ঘটনাবলীর উল্লেখ করে বলে দে'ন যে, দশ দিন বাদে বুদ্ধের পূতাস্থি নিয়ে শোভাযাত্রা বা'র হবে। অতএব নাগরিকেরা যেন সেই পূতাস্থির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবার জন্য প্রস্তুত হন এবং তাঁদের বাড়ীঘর সব সাজাতে সুরু করেন।

এর পর ৫০০ বোধিসত্ত্বের প্রতিকৃতি, চিত্রাদি ও বুদ্ধের পূতাস্থিটি বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে একটি শোভাযাত্রা বার হয়, এবং নগর থেকে বেরিয়ে নগরের বাইরে অবস্থিত 'অভয়গিরি বিহারে' গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে প্রায় ৯০ দিন ধরে বুদ্ধের পূতাস্থিটি সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে বাইরে সজ্জিত করে রাখা হয়। তার পর পুনরায় সেটিকে নগরীতে ফিরিয়ে আনা হয়।

'অভয়গিরি বিহারের' পূবে পাহাড়ের উপর আরও একটি বিহার আছে যার নাম 'চৈত্য বিহার'। বিহারে প্রায় ১০০০ ভিক্ষু বাস করেন। এই বিহারে ধর্ম্মগুপ্ত নামে একজন শ্রমণ আছেন যাঁকে রাজ্যের সবাই খুব শ্রদ্ধা করে। এই শ্রমণ এতই সহৃদয় যে, তাঁর গুহার মধ্যে সাপ ও ইঁদুরকে কোনরূপ বিবাদ না করে এক সঙ্গে বাস করতে দেখা গেছে।

ফা-হিয়েন এখানে একটি ভিক্ষুর দাহকার্য্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নগরীর দক্ষিণ দিকে ভিক্ষুদের জন্য নির্দ্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে মৃতদেহটি নিয়ে যাওয়া হয়। চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি কাষ্ঠের তৈরী এই সমাধিক্ষেত্রটি একটি বিরাট পাহাড়ের শীর্ষদেশে অবস্থিত। এখানে চন্দন ও অন্যান্য কাষ্ঠের তৈরী একটি বিরাট চুল্লী সাজান আছে। সেখানে মৃতদেহ পুষ্প দিয়ে সজ্জিত করে নিয়ে

যাওয়া হয় এবং উপস্থিত সকলে মৃত ভিক্ষুর প্রতি তাঁদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে কিছু কিছু ফুল মৃতদেহের উপর ছড়িয়ে দিলে পর দেহটিকে চুল্লীর উপর রাখা হয়। মৃতদেহের উপর সুগন্ধি তেলও ঢেলে দেওয়া হয়। এর পর চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং উপস্থিত সকলেই নিজেদের উত্তরীয়, ছত্র প্রভৃতি চুল্লীর উপর ফেলে দেন যাতে করে আগুনটা বেশ ভাল করে জ্বলে ওঠে। মৃতদেহটা পুড়ে গেলে উপস্থিত লোকেরা পূতাস্থি নিয়ে ফিরে যায় এবং পরে এরই উপর একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করে।

ফা-হিয়েনের এখানে অবস্থানকালে এদেশের রাজা একটি নূতন বিহার নির্ম্মাণ করার পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি একটি বিরাট সভা ডাকেন। তার পর একজোড়া বলদকে বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে তাদের কাঁধে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত জোয়াল লাগিয়ে দিয়ে যে জমির ওপর বিহারটি নির্ম্মিত হবে সেই জমিতে দাগ দিয়ে দেন। বিহার শেষ হলে পর এই বিহারের বিবরণী ও দামের কথা ধাতুনির্ম্মিত ফলকে লিখে রাজা এই বিহারের গায়ে আটকে দেন যাতে তাঁর বংশধরেরা এ নিয়ে পরে ভিক্ষুদের ওপর কোনরূপ জোরজবরদস্তি করতে না পারে।

ফা-হিয়েন সিংহল দেশে প্রায় ২ বৎসর ছিলেন এবং এখানেই তিনি মহীশাসকদের 'বিনয় পিটকের' দীর্ঘাগম, সংযুক্তাগম ও 'সন্নিপাত সূত্রের' একটি করে অনুলিপি প্রস্তুত করেন। এর পর ফা-হিয়েন একটি চীনা সওদাগরী জাহাজে করে পুনরায় যাত্রা সুরু করেন। প্রথমে আবহাওয়া জাহাজ চলাচলের বেশ অনুকূলেই ছিল, কিন্তু কয়েকদিন পর এই আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখা যায় এবং জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের সম্মুখীন হয়। জাহাজডুবির ভয়ে বণিকেরা তাঁদের মূল্যবান দ্রব্যাদি সবই সমুদ্রের জলে ফেলে দেন, ফা-হিয়েনও তাঁর অনেক জিনিস অর্থাৎ জলের কলসী, ঘটি প্রভৃতি জলে ফেলে দিলেন। পাছে বণিকেরা তাঁর এত কষ্টের সংগৃহীত ধর্ম্মপুস্তকাদি ও ধর্ম্মচিত্রাদি জলে ফেলে দেয়, তাই তিনি মনে-প্রাণে 'অবলোকিতেশ্বরকে' ডাকতে থাকেন এবং

প্রার্থনা জানান যেন নিরাপদেই তিনি এইসব অমূল্য পুস্তকাদি নিয়ে স্বদেশে পৌঁছোতে পারেন। অবশেষে তের দিন পরে সেই ঝড়ের উপশম হয়। এরপর নাবিকেরা খুব সতর্কতার সঙ্গে জাহাজ চালাতে থাকেন এবং প্রায় ৯০ দিন পর জাহাজ যবদ্বীপে এসে পৌঁছায়।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরই প্রাধান্য বেশী। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এখানে নেই বললেই হয়। এখানে প্রায় পাঁচ মাস অবস্থানের পর ফা-হিয়েন অন্য একটি জাহাজে করে পুনরায় চীন অভিমুখে যাত্রা করেন। এবারও মাঝপথে জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের মুখে পড়ে এবং জাহাজের গতিপথ বদলে যায়। নাবিকেরাও ঠিক করতে পারে না যে, কোন দিকে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছে। জাহাজের যাত্রীরা এই হঠাৎ-আসা সামুদ্রিক ঝড়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফা-হিয়েনের প্রতি দৃষ্টি দেন। তাঁদের মধ্যে যখন সলাপরামর্শ চলছে যে, ফা-হিয়েনকে নিকটবর্ত্তী কোন দ্বীপকূলে নামিয়ে দিলেই বোধ হয় দেবতার কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচা সম্ভব হবে, তখন তাঁদেরই একজন বলেন যে, এই ভিক্ষুকে যদি এভাবে অকুলে ফেলে যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করা হয় তাহলে ফা-হিয়েনের আগে তাঁকেই নামিয়ে দিতে হবে। তিনি আরও বলেন যে, চীনের রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান ভক্ত ও ভিক্ষুদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন; যদি তাঁরা এই ভিক্ষুকে মাঝপথে ফেলে যা'ন তাহলে চীন-সম্রাটকে তিনি সেকথা জানিয়ে দিতে বাধ্য হবেন। এসব শুনে শেষ পর্য্যন্ত নাবিকেরা ফা-হিয়েনকে মাঝপথে নামিয়ে দিতে সাহস করেন না। প্রায় ৭০ দিন চলার পর নাবিকেরা জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে অন্য পথে চলতে সুরু করেন এবং ৮২ দিনের মাথায় চাং-কুয়াং-এর অন্তর্ভুক্ত লাওসানের দক্ষিণ-তীরে এসে নোঙ্গর ফেলেন। প্রথমে তাঁরা বুঝতেই পারেন নি যে, কোন্ দেশে এসে পৌঁছেচেন। যাই হোক সমুদ্র-উপকূলের অধিবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন যে তাঁরা চীনদেশেই এসে পৌঁচেছেন। সমুদ্র অতিক্রম করে একজন ভিক্ষু ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও চিত্রাবলী সংগ্রহ করে এনেছেন—এই সংবাদ পেয়ে এ-অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা নিজে এসে ফা-হিয়েনকে সম্বর্দ্ধনা জানান। এরপর তিনি আরও

দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ-দেশের রাজধানী চিয়েন-কাং-এ এসে পৌঁছান এবং সেখানে ভারতীয় ভিক্ষু বুদ্ধভদ্রের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাঁর সংগৃহীত পুস্তকাবলী ও ধর্ম্মচিত্রাবলী দেখান।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

চ্যাং-গান থেকে যাত্রা করে ফা-হিয়েন ছ'বছর পথে কাটিয়ে মধ্যরাজ্যে পৌঁছান এবং সেখানে ছ'বছরকাল অবস্থান করে আরও তিন বছর ফিরতি পথে কাটিয়ে প্রায় ১৫ বৎসর বাদে তিনি চিং-চোতে এসে পৌঁছান। মরুভূমির পশ্চিম দিক থেকে ভারতে পৌঁছাতে প্রায় ৩২টি দেশ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে। পথে যেসব শাস্ত্রজ্ঞ ভিক্ষুদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তাঁদের পুরো ববরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে চীনদেশের ভিক্ষুদের শুধু এটুকু জানানই সঙ্গত হবে যে, ফা-হিয়েন তাঁর নিজের জীবন তুচ্ছ করে মরুভূমি, সমূদ্র অতিক্রম করেছেন এবং পথে অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েছেন বা অনেক বিপদাপদকে অতিক্রম করে ভগবান বুদ্ধের ঐশ্বরিক করুণাবশেই তিনি নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে ফিরে আসতে পেরেছেন। তাঁর এই দুঃসাহসিক দুঃখকষ্ট, বেদনা ও আনন্দ-ভরা ভ্রমণের ইতিবৃত্ত তিনি লিখে রেখে যাচ্ছেন এই ভেবে যে, গুণী পাঠকেরা তাঁর বর্ণিত ও লিখিত ঘটনাবলীর কথা জানতে পারবেন, উপলব্ধি করতে পারবেন এবং তাঁরই (ফা-হিয়েনের) মতই উপকৃত হবেন।

ফা-হিয়েন স্ব-লিখিত ভ্রমণকাহিনী যা তিনি নিজের জবানীতে না লিখে ইতিবৃত্তকারের জবানীতে লিখে গেছেন—এইখানেই তার সমাপ্তি কিন্তু এরপর আরও একটি পরিচ্ছেদ তাঁর সমসাময়িক এক সহধর্ম্মী ভিক্ষু উপরোক্ত ভ্রমণকাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। নিম্নে সেই পরিচ্ছেদের বিবরণ দেওয়া হ'ল।

* * * *

৪১৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে আমরা শ্রদ্ধেয় ফা-হিয়েনকে সম্বর্দ্ধনা জানাই। তিনি যখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তখন আমরা তাঁকে তাঁর ভারত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শোনাবার জন্য বার বার অনুরোধ করি এবং সেই অনুরোধ রাখতে

তিনি স্বীকৃত হ'ন। তিনি আমাদের যা বলেছিলেন তার প্রতিটি বিবরণ আমাদের সত্য বলেই মনে হয়। সেইজন্য আমরা তাঁকে তাঁর বিবৃত সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্তের পুরো ইতিবৃত্ত শোনাতে পুনরায় অনুরোধ করি। তিনি আমাদের সেই অনুরোধও শেষ পর্য্যন্ত রাখেন। তিনি আমাদের বলেন, 'যখন আমি ভাবতে চেষ্টা করি যে, কিভাবে আমি ভ্রমণ করেছি তখন আমার সারা গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি শিউরে উঠি, আমার দেহ হিম হয়ে আসে। তিনি আরও বলেছিলেন যে, আমি যে এত বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলাম, তা আমার নিজের স্বার্থের জন্য নয়—আমার লক্ষ্য ছিল এক এবং মনপ্রাণ সেই লক্ষ্যের মধ্যে তন্ময় ছিল। সেইজন্যই আমি এমন এক ভ্রমণের সঙ্কল্প নিয়েছিলাম যাতে দশ হাজারের মধ্যে একটা লোকও বেঁচে ফিরে আসে না।'

ফা-হিয়েনের বিবরণী শুনে আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এই ফা-হিয়েনের মত দৃঢ়মনা লোক প্রাচীন যুগে কেন বর্ত্তমান যুগেও বিরল। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম পূর্ব্বেই বহুল-প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু ফা-হিয়েনের মত এমন নিঃস্বার্থ ভাবে পূর্ব্বে কেউই ধর্ম্মপুস্তকের সন্ধান করেন নি। এর থেকে আমরা এইটুকু বুঝতে পারি যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি যদি প্রবল থাকে এবং যদি কেউ একমন একপ্রাণ হয়ে কোন কাজে লেগে থাকে তাহলে জয়ী সে হবেই, ফা-হিয়েনও এই কারণেই জয়ী হয়েছেন। অপরে যেটাকে মূল্য দিয়েছেন ফা-হিয়েন সেটাকে মূল্য দে'ন নি; আবার অপরে যেটাকে মূল্য দেয় নি ফা-হিয়েন সেটাকেই মূল্য দিয়েছেন এবং মূল্যহীনকে অমূল্য রূপে বরণ করেছেন।
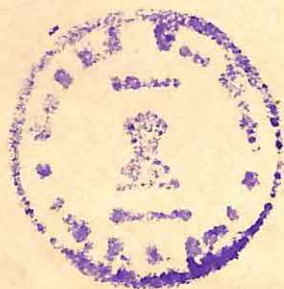
অন্যান্য বাংলা প্রকাশন

হেস্‌সে, হে.—সিদ্ধার্থ ॥ ৩৲ ॥

শীলভদ্র অনূদিত এই বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসখানি ভারতীয় জীবন-দর্শন নিয়ে রচিত। অনুবাদ প্রায় মৌলিক রচনার মর্য্যাদা পেয়েছে বলে সুধীজন কর্তৃক স্বীকৃত।

ওয়েই পেই—বাস্তু পেল বাস্তুহারা ॥ ২৲ ॥

নয়া চীন কি করে তা'র দারিদ্র্য ও উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান করছে তা'র জীবন্ত আলেখ্য। বিজ্ঞানী বীরেশচন্দ্র গুহের মনোজ্ঞ ভূমিকাসহ।

মুখোপাধ্যায়, কা.—দুই নারী ॥ ২৲ ॥

দেশবিভাগ ও মহাযুদ্ধের পটে হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের জীবনে যে ভাঙ্গন ও বিপর্য্যয় এসেছে তা'রই করুণ উপাখ্যান।

মুখোপাধ্যায়, হ. ও উ.—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতের জাতীয় আন্দোলন। সচিত্র ॥ ৭৲ ॥

সেনগুপ্ত, শৈ. না.—সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের মূলকথা ॥ ৫৲ ॥

বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃত ব্যাকরণের তথ্য ও তত্ত্ব অত্যন্ত সহজ ও সরস ভঙ্গীতে এই প্রথম।

রায়, কিরণশঙ্কর—সপ্তপর্ণ ॥ ৩৲ ॥

শোভন ২য় সংস্করণ। কংগ্রেসী মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রাজনীতি থেকে দূরে থাকলে অবশ্যই যশস্বী ছোট গল্প-লেখক বলে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র এই গল্পগুলির প্রথম আবির্ভাবে এ-কথাই বলেছিলেন।

মুখোপাধ্যায়, হ. ও উ.—জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ ৪৲ ॥

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক স্বদেশ-ব্রতী চিন্তাগুরু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণ জীবনকথা বাংলা ভাষায় অপর কোন পুস্তকে প্রচারিত হয়নি।

ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পঞ্চোপাসনা ॥ ১২৲ ॥